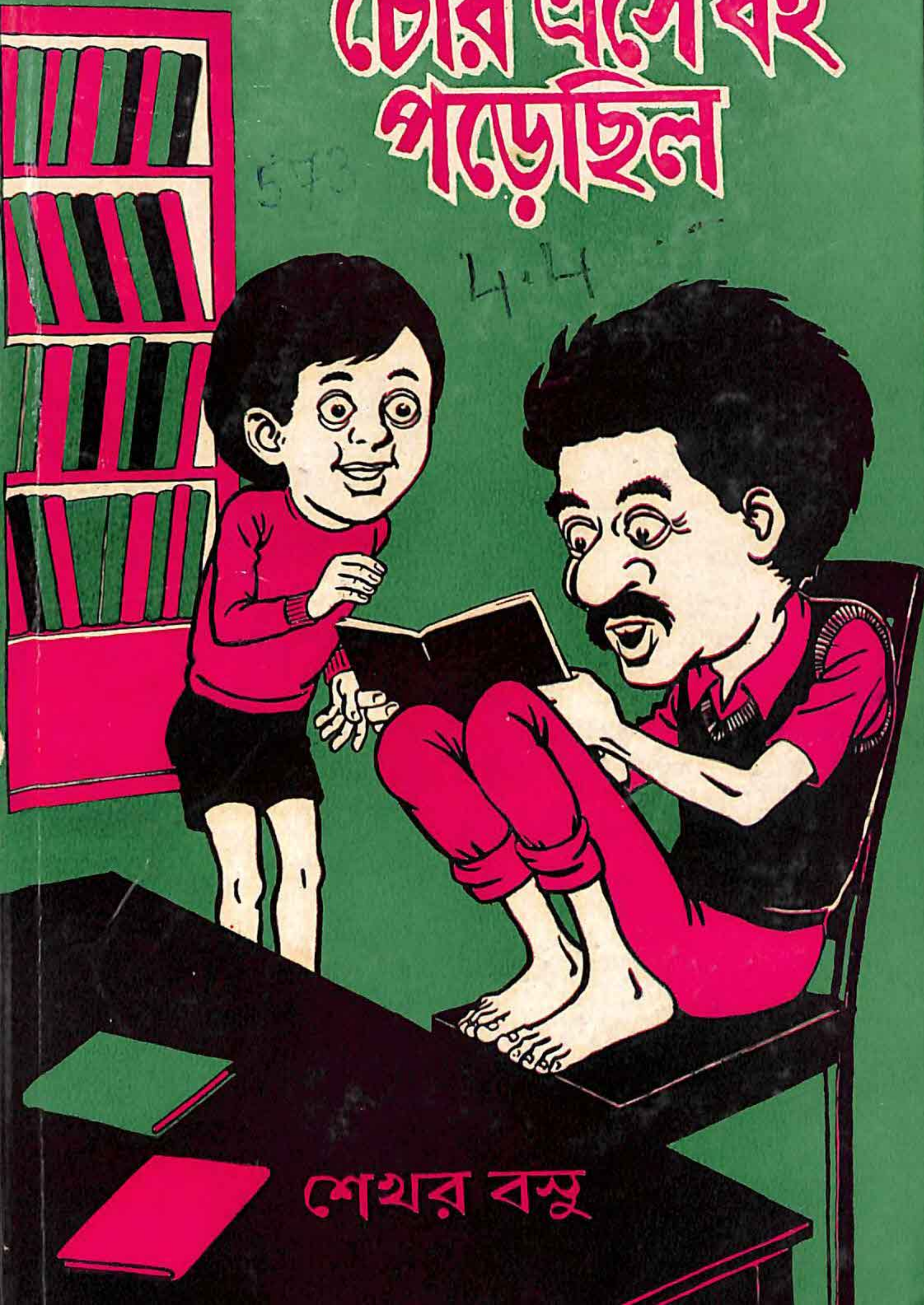
চোর এসে বই পড়েছিল

শেখর বসু





চোর এসে বই পড়েছিল

শেখর বসু

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta-700007 (1st floor)

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ় ১৩৯২
জুলাই ১৯৮৫

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর :
তাপস সাঁতরা
সন্তোষী প্রিন্টার্স
১৪৩, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা-৯

ব্লক :
রঞ্জিত দত্ত
বি, ডি, কনসার্ন
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ চিত্র :
অমিয় ভট্টাচার্য

অলংকরণ :
শ্রীবিদ্যাঅশোক

দশ টাকা মাত্র



চোর এসে বই পড়েছিল

এই চোরটা ভীষণ অভিমানী। কথায়-কথায় ওর চোখে জল এসে যায়। কিন্তু এখানে কথা বলার কেউ নেই, দোষ দেবারও কেউ নেই। দোষ দিতে গেলে নিজেকেই দিতে হয়। চোর নিজের কপালকে দোষ দিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল লম্বা করে।

বৃষ্টি-বাদলার রাত, কনকনে হাওয়া বইছে সমানে। এইরকম দুর্যোগ মাথায় করে চুরি করতে বেরিয়েছে এই চোরটা। বেচারা এ-গলি সে-গলি করে এই বাড়িটার পেছনদিকে এসে হাজির হয়েছিল। বাড়ির পেছনে আছে একটা ভাঙাচোরা জলের পাইপ। সেই পাইপ বেয়ে কত কষ্ট করেই না উঠেছে তিনতলায়। তিনতলায় একটাই মোটে ঘর।

এই ঘরে ঢোকার আগে চোর বেচারা কত কিছু আশা করেছিল। ভেবেছিল ঘরে ঢুকেই দেখবে, ঘরের লোক ভুল করে স্টিলের আলমারির গায়ে চাবিটা লাগিয়ে রেখে ঘুমে অজ্ঞান হয়ে আছে। আলমারি খুললেই পাওয়া যাবে থরে-থরে সাজানো টাকা আর

গয়না! পাশে থাকবে একটা খালি সাইডব্যাগ। টাকা আর গয়না সেই ব্যাগে ঢুকিয়ে টুক্ করে কেটে পড়লেই হলো।

কিন্তু ঘরে পা দিতেই ওর স্বপ্ন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ঘরে একটার বদলে চার-চারটে আলমারি আছে, তবে সব কটা আলমারিই বইয়ের। একপাশে পেল্লায় একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার। ঘরটা নেহাতই একটা পড়ার ঘর।

এই ঘরটা ছাড়া তিনতলায় আর কোনো ঘর নেই। এখান থেকে দোতলায় নামার সিঁড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তার মানে আবার সেই কষ্ট, রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে নীচে নামতে হবে। তেমন কিছু চুরি করতে পারলে এই কষ্টটা কষ্ট বলেই মনে হতো না চোরের। কিন্তু পড়ার ঘর থেকে ও কী চুরি করবে?

শুকনো মুখে নীচে নামার সময় বৃষ্টি নামল তেড়ে। শীতের বৃষ্টি ছুরির মতো গেঁথে যাচ্ছিল গায়ে। চোরের আর নামা হলো না, ও ছুটে এসে আবার ঢুকে পড়ল পড়ার ঘরে। এ-ঘরে কেউ নেই, এখানে আরো কিছুক্ষণ বসে বৃষ্টি ধরার জন্যে অপেক্ষা করা যেতে পারে অনায়াসে!

দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের আলো জ্বালল চোর। তারপর একটা চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চারদিকের বইয়ের আলমারিগুলো দেখতে লাগল। প্রতিটি আলমারিই বইপত্তরে ঠাসা। বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে গেল চোরের। ইশ্! তখন একটু মন দিয়ে পড়াশুনো করলে আজ আর এত কষ্ট করে চুরি করতে হতো না।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। নেহাত সময় কাটাবার জন্যে চোর মাস্টার-কি দিয়ে এক-এক করে সব কটা বইয়ের আলমারির তালা খুলে ফেলল। তারপর এ-বই সে-বই টানতে-টানতে হঠাৎ ওর চোখ গেল চকচকে একটা চটি বইয়ের দিকে। বইটার নাম 'তেপান্তরের মায়াকান্না'।

এই তো সেই বই। বইটা হাতে তুলে নিতেই ছেলেবেলার কত

কথা হুড়মুড় করে মনে পড়ে গেল চোরের। দারুণ বই, কিন্তু বইটা ও শেষ করতে পারেনি। স্কুলের পড়া তৈরির সময় 'তেপান্তরের মায়াকান্না' পড়ার জন্যে ওর বাবা ওকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন। কী মার, কী মার! তারপর লুকনো বইটা ও আর কোনোদিনই খুঁজে পায়নি।

কী যেন নাম ছেলেটার? দারুণ সাহসী। মায়াকান্নার রহস্য ভেদ করার জন্যে একা-একা গিয়ে হাজির হয়েছিল তেপান্তরের মাঠে। কী সাংঘাতিক-সাংঘাতিক সব কাণ্ড ঘাটে গিয়েছিল সেই মাঠে, ছেলেটা কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি। দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে ছেলেটা যখন বিরাট এক চোরের দলকে ধরে ফেলেছে প্রায়, ঠিক সেই সময়েই বইটা বেহাত হয়ে গিয়েছিল।

কতকালের পুরনো সেই দুঃখটা হঠাৎ চোরের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল। আস্ত একটা গোয়েন্দা-গল্পের বই না পড়তে পারার দুঃখ একরকম, আর অর্ধেক-পড়া বই কেউ কেড়ে নিলে তার দুঃখ আর এক রকম। বইটা তখন ও সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও উদ্ধার করতে পারেনি। এতকাল বাদে সেই বই হঠাৎ হাতে এসে যাওয়ায় পুরনো গল্পের নেশা চেপে ধরল চোরকে।

বৃষ্টি বোধহয় আরো বেড়ে গিয়েছিল। গ্যারেজের টিনের চালে শব্দ উঠছিল চড়চড় করে। জানলার ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প শীতের হাওয়া ঢুকছিল ঘরের মধ্যে। গোয়েন্দা-গল্প পড়ার আদর্শ পরিবেশ। চোর চেয়ারের ওপর আয়েশ করে বসে 'তেপান্তরের মায়াকান্না' পড়তে শুরু করে দিল মাঝখান থেকে। মাঝখান পর্যন্ত সব ঘটনা ওর মনে আছে, বাকিটা পড়ে নিলেই হলো। চটি বইয়ের অর্ধেক পড়তে কতক্ষণই বা সময় লাগবে। এর মধ্যে বৃষ্টিও ধরে যেতে পারে।

কয়েক পাতা পড়তে না পড়তেই দুর্দান্ত সব ঘটনায় চোরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। গল্পের বইয়ের অল্পবয়েসী ছেলেটার সাহস, বুদ্ধি আর গায়ের জোর সত্যিই তারিফ করার মতো। ভয়ংকর সব চোরের ডেরায় একা ঢুকে পড়েছে ছেলেটা, পায়ে-পায়ে বিপদ।

যে-কোনো মুহূর্তে ও ধরা পড়তে পারে, আর ধরা পড়লেই মৃত্যু।

জায়গাটা এত ভয়ের যে, এই চোরটাই বই পড়তে-পড়তে কয়েকবার চমকে উঠে পেছন দিকে তাকাল। না, পেছনে অন্য কোনো চোর নেই। পড়ার ঘরের দরজাটা আগের মতোই ভেজানো। আগের মতোই বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে।

চোর আবার গল্পের বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল। ডোবা মানে এমনই ডোবা যে, টেরই পেল না বৃষ্টি ধরে গেছে কখন! শুধু বৃষ্টিই ধরেনি, একটু-একটু করে ভোরের আলোও ফুটতে শুরু করেছে আকাশের গায়ে।

এ-বাড়িটা টিকলুদের। টিকলু সপ্তাহে তিনদিন ভোর পাঁচটায় উঠে ব্যাডমিন্টন খেলতে যায়। ঘুম ভাঙার নিয়মটা খুব মজার। সপ্তাহে তিনদিন কোনো এক সময়ে উঠলে বাকি তিনদিনও ঠিক সেই সময়ে ঘুম ভেঙে যায়। আজ টিকলুর ব্যাডমিন্টন খেলতে যাবার দিন নয়, কিন্তু ঠিক পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল ওর। ঘুম ভেঙে গেলে টিকলু বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না একদম। ও দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়। আর বারান্দায় বেরুতেই দেখতে পেল ছাতে যাবার সিঁড়িতে ঝকঝকে এক ফালি আলো পড়ে আছে। ছাতের ঘরটা ওর পড়ার ঘর। কাল রাত্তিরে ঠিক তাহলে ও-ঘরের আলো নেভাতে ভুলে গেছে।

মা'র বকুনির ভয়ে পড়ার ঘরের আলো নেভাতে গেল টিকলু। পড়ার ঘরের দরজাটা ভেজানো, ভেতরে আলো জ্বলছে! দরজা খুলতেই অবাক হয়ে গেল টিকলু। এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে খুব মন দিয়ে বই পড়ছেন। এতই মন দিয়ে পড়ছেন যে পেছনে একবার তাকালেন না পর্যন্ত। ভদ্রলোক কে? বাবার বন্ধু কি? রাত্তিরে এখানে ছিলেন? এইসব ভাবতে-ভাবতে টিকলু পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। আরে! ভদ্রলোক 'তেপান্তরের মায়াকান্না' পড়ছেন। বইটা টিকলুর দারুণ প্রিয়। পাশে দাঁড়িয়ে টিকলু ফিসফিস করে বলল,

"গল্পের শেষটা বলে দেব ?"

ওর কথা শুনে চোর ভীষণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। কাউকে চমকে দিতে পারলে টিকলু খুব মজা পায়। ও মজার গলায় আবার বলল, "বলে দেব গল্পের শেষটা ?"

চোর এখন গল্পের সাঙ্ঘাতিক জায়গায়। এত জমে গেছে যে এখানে চুরি করতে ঢোকার কথা ওর আর মনেই নেই। প্রায় হাতজোড় করে টিকলুকে বলল, "লক্ষ্মীটি বোলো না। গোয়েন্দা গল্পের শেষেই তো আসলে মজা।"

টিকলু আর কিছু বলল না, কেননা এর মধ্যেই ওর চোখে পড়েছে খোলা আলমারিতে সাজানো টিনটিনের বইগুলো। টিনটিনের বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে টিকলু কিন্তু পরীক্ষা এসে গেছে বলে এখন ওর গল্পের বই ছোঁয়া বারণ। গল্পের বইয়ের আলমারিতে তালা পড়েছে, খোলা হবে পরীক্ষার পরে। সেই আলমারি হঠাৎ খোলা দেখে টিকলু ছুটে গিয়ে টিনটিনের একটা বই তুলে নিল।

পড়ার ঘরের দুই চেয়ারে এখন দু'জন পড়ুয়া। একজন পড়ছে 'তেপান্তরের মায়াকান্না', আর একজন পড়ছে 'টিনটিন ইন টিবেট'। এদিকে ভোরের আলো বাড়তে-বাড়তে দিব্যি সকাল হয়ে গেল। টিকলুর মা আর বাবা উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে। একটু পরে খোঁজ পড়ল টিকলুর। কোথায় গেল ও ? টিকলুর মা একবার ভাবলেন, ও বোধহয় ব্যাডমিন্টন খেলতে গেছে। তারপরেই খেয়াল হলো, আজ তো ওর ব্যাডমিন্টন খেলতে যাবার দিন নয়। তাহ'লে ও গেল কোথায় ?

এ ঘর ও ঘর খোঁজ করতে-করতে টিকলুর মা উঠে এলেন ছাতে। পড়ার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল টিকলু বই পড়ছে একমনে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে গিয়েই পিছিয়ে এলেন। আরে। এই সাত-সকালে ওর মাস্টারমশাইও এসে গেছেন !

চোর দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে 'তেপান্তরের মায়াকান্না' পড়ছিল। টিকলুর মা তাকেই টিকলুর মাস্টারমশাই ভেবে নেমে এলেন নীচে। তারপর হাসতে-হাসতে টিকলুর বাবাকে বললেন,

"টিকলুর মাস্টারমশাইয়ের কাণ্ড দেখেছ, এই ভোরবেলাতেই পড়াতে চলে এসেছেন।"

বাবা একটু হেসে বললেন, "যাক তোমার ছেলের তাহলে পড়াশুনোয় বেশ মন গেছে দেখছি। মাস্টারমশাইয়ের ক্ষমতা আছে বলতে হবে। ওইরকম বাঁদর ছেলে টুঁ শব্দ না করে পড়তে বসে গেল ভোরবেলায়।"

টিকলুর মাস্টারমশাই দারুণ ভাল ছাত্র, তবে একটু খেয়ালি। কোনোদিন একটানা তিন ঘণ্টা পড়ান, কোনোদিন আধঘণ্টা। আসার সময়ের ঠিক থাকে না কখনো। তবে এর আগে কোনোদিন এত ভোরে পড়াতে আসেননি। এইসব ভেবে টিকলুর মা মাস্টারমশাইয়ের ওপর ভীষণ খুশি হয়ে বিশুর হাত দিয়ে মস্ত ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিলেন পড়ার ঘরে। বিশু এ বাড়ির নতুন কাজের লোক। একটু সাদাসিধে, তবে খুব কাজের!

বিশুর পায়ের শব্দে 'তেপান্তরের মায়াকান্নার' পাঠক আর একবার চমকে উঠেছিল, কিন্তু কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। এবার বলি, ব্রেকফাস্টে কী-কী ছিল। কর্নফ্লেকস, দুধ, ডিমের পোচ, টোস্ট আর কলা। সবশেষে একজনের কফি আর একজনের জন্যে চা।

চোরের বুক ধড়ফড় করছিল সমানে। বাইরে খটখটে সকাল। এ-বাড়ি সে-বাড়ির সব লোক উঠে পড়েছে। পালাবার আর কোনো পথ নেই। ধরা পড়তেই হবে। আর ধরা পডলে কী হবে, সে-কথা যে-কোনো একটা বাচ্চা চোরও জানে।

চোরের শুধু ভয়ই করছিল না, খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড, বিশেষ করে সামনে এত খাবার-দাবার দেখে। কী আর করবে বেচারা? কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়। তাই পিঠে সওয়াবার জন্যে সব খাবার খেয়ে নিল চোর। টিকলু টিনটিনের বইয়ের সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে, চোর একবার ওকে মিনমিন করে বলল, "কই তুমি তো খাচ্ছ না।"

কিন্তু সে-কথা টিকলুর কানেই গেল না।

দোতলার দৃশ্য অন্যরকম। টিকলুর বাবা তাঁর কারখানায় যাবেন বলে তৈরী হয়েছেন। টিকলুর মাও তৈরী, মা যাবেন গড়িয়াহাটে বাজার করতে। ড্রাইভার গাড়ি বার করেছে।

টিকলুর বাবা চক্‌চকে দু'টো একশো টাকার নোট একটা সাদা খামে ভরে টিকলুর মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "মাস্টারমশাইয়ের মাইনেটা দিয়ে দাও।"

টিকলুর মা খামটা নিয়ে পড়ার ঘরের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকলেন, "টিকলু, এই টিকলু।"

টিকলু টিনটিনের দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চারের জালে এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, মায়ের ডাক ওর কানেই গেল না প্রথমে। তারপর যখন শুনতে পেল, তখন ওর বুক কেঁপে উঠল ধক্ করে। সর্বনাশ! মা এখন ওকে টিনটিন পড়তে দেখলে মেরে শেষ করবেন। টিকলু কোনোমতে বইটা লুকিয়ে রেখে মুখ কালো করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কিন্তু মা ওকে বকার বদলে গাল টিপে আদর করে বললেন, "লক্ষ্মী ছেলে, আজ যে দেখছি পড়াশুনোয় খুব মন বসেছে! শোনো, আমি তোমার বাবার সঙ্গে বেরুচ্ছি, বাজার করে ফিরব। শান্ত হয়ে থাকবে, আর এই খামটা মাস্টারমশাইকে দিয়ে দিও।"

মার খাওয়ার বদলে আদর খেয়ে টিকলু এতই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, মায়ের সব কথা ওর কানেই ঢুকল না ভাল করে। কিন্তু ঘরের মধ্যে যে লোকটা বসে আছে সে সব শুনে নিল।

মা চলে যেতেই টিনটিনের ভয়ংকর সব কাণ্ডকারখানা আবার ভিড় পাকিয়ে ফেলল টিকলুর মাথার মধ্যে। ও একছুটে ঘরে ঢুকে খামটা চোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে 'টিনটিন ইন টিবেট'-এ ডুবে গেল আগের মতো।

মিনিট-পনেরো বাদে চোর খামটা পকেটে ভরে দুগ্‌গা-দুগ্‌গা বলে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল। তারপর জোর পায়ে হেঁটে মিশে গেল রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে। বেশ কিছুটা দূরে যাবার পর চোরের

সে কী আনন্দ, আর কেউ ওকে ধরতে পারবে না। তার ওপর পকেটে আছে দু'টো কড়কড়ে একশো টাকার নোট। মনে-মনে টিকলুর মাকে অনেক ধন্যবাদ জানাল চোর। সকালে কী দারুণ খাইয়েছেন। এত ভাল খাবার ও বহুকাল খায়নি!

ওদিকে টিকলুদের বাড়িতে আসল মাস্টারমশাই আসার পরে পুরো ব্যাপারটাই জানাজানি হয়ে গেল। টিকলুর মা চোখ গোলগোল করে বললেন, "কী সাংঘাতিক কাণ্ড, বাড়িতে চোর ঢুকেছিল আর তুই তার সঙ্গে অতক্ষণ ধরে দিব্যি গল্প করে গেলি?"

টিকলু আমতা-আমতা করে বলল, "গল্প করব কেন? ও তো বই পড়ছিল।"

"বই! কী বই?"

টিকলু এবার ঝলমলে মুখ করে বলল, "তেপান্তরের মায়াকান্না। দারুণ বই, বইটা তুমি পড়েছ মা?"

মা ওকে এক ধমক লাগিয়ে বললেন, "চুপ কর।"

তখন ধমক লাগালেও পরে কিন্তু টিকলুর মা 'তেপান্তরের মায়াকান্না' পড়েছিলেন। আহা! চমৎকার বই। এত ভাল বই নাকি চট করে পাওয়াই যায় না। খুব ভাল বই পড়লে আর কাউকে পড়াতে ইচ্ছে করে তো, টিকলুর মা তাই এখন টিকলুর বাবাকে বইটা পড়াবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছেন। টিকলুর বাবা ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, তবে কথা দিয়েছেন, সামনের রোববারেই বইটা পড়ে ফেলবেন।

———



কুমিরের পিঠে চড়ে

মাস্টারমশাই বুবুদের ক্লাসে রবিনসন ক্রুসোর গল্প শোনাবার পরে বললেন, "ক্রুসো একা-একা একটা দ্বীপে আঠাশ বছর কাটিয়েছিলেন। ক্রুসোর জায়গায় তোমরা কেউ থাকলে অদ্দিন একা-একা থাকতে পারতে ?"

ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল, তারপর কেউ-কেউ বলল, "পারতাম স্যার।"

মাস্টারমশাই বললেন, "তারপর বাড়ি ফিরতে কী করে ?"

বাড়ি ফিরে আসার উপায়টা কেউ চট করে বলতে পারল না। মাস্টারমশাই বললেন, "ঠিক আছে, এই নিয়ে তোমরা একটা গল্প লিখে নিয়ে আসবে। তবে রবিনসন ক্রুসো যে-ভাবে ফিরেছে সেইভাবে ফিরলে চলবে না কিন্তু। মাথা খাটিয়ে বাড়ি ফেরার নতুন পথ বার করতে হবে তোমাদের।"

ক্লাস থ্রির ছাত্র সংখ্যা পঞ্চাশ। মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে

পঞ্চাশটা ছাত্রের মাথার মধ্যে অসংখ্য চিন্তা-ভাবনা কিলবিল করে উঠল। সত্যি, ওই রকম একটা দ্বীপ থেকে কী ভাবে ফেরা যায়?

জাহাজডুবি হয়েছে। সঙ্গে কোনো নৌকো নেই, সঙ্গীসাথী নেই। সামনে বিশাল সমুদ্র। নির্জন দ্বীপ থেকে ওই বিরাট সমুদ্র পেরিয়ে কী ভাবে বাড়ি ফিরবে?

বাড়ি ফেরার উপায় ভাবতে-ভাবতে স্কুল ছুটির পরে বাড়ি ফিরে গেল সবাই। পঞ্চাশটা ছাত্র কী-কী গল্প বানিয়েছিল, আমার পক্ষে জানার উপায় নেই। আমি শুধু বুবুর গল্পটার কথাই জানি। বুবুর ভাল নাম শমীক বসু। তবে আমি তাকে 'বুবু' বলেই ডাকি।

বুবু স্কুল থেকে বড়িতে ফিরেই পেনসিল চিবোতে শুরু করে দিল। তাই দেখে ওর মা ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে বললেন, "পেনসিল মুখে দিতে নেই।"

উত্তরে বুবু বলল, 'একদম বিরক্ত করো না তো। আমি এখন একটা নির্জন দ্বীপে আট্‌কা পড়ে আছি। চারদিকে বিশাল সমুদ্র, কী ভাবে বাড়ি ফিরব তা ভাবতে হবে না আমাকে?"

বুবুর বাবা অফিস থেকে ফেরেন সাড়ে-পাঁচটায়। বুবু তখন ছাতে বন্ধুদের সঙ্গে বল খেলে। আজ ওকে জানলার ধারে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে তুই খেলতে গেলি না আজ?"

বুবু কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবা, একটা কুমিরের পিঠে প্লাস্টিকের ঘর চুম্বকের মতো লেগে থাকতে পারে?"

কী কথার কী উত্তর! বাবা বললেন, "অ্যাঁ?"

বুবু একই প্রশ্ন আবার করে বলল, "বলো না, কুমিরের পিঠে প্লাস্টিকেরঘর চুম্বকের মতো লেগে থাকতে পারে?"

বাবা জামাকাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, "চুম্বক শুধু লোহার সঙ্গে লাগে। কুমিরের পিঠ তো আর লোহা নয়, আর প্লাস্টিকের ঘর চুম্বক নয়, লেগে থাকবে কী করে?"

"কিন্তু কুমিরের পিঠ তো লোহার মতো শক্ত।"

"লোহার মতো আর লোহা কি এক জিনিস ?"

দুশ্চিন্তায় পড়ল বুবু, তারপর নিজের মনেই বলল, "তাহ'লে !"

"তাহ'লে কী ?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

'ভাবছি কুমিরের পিঠের সঙ্গে প্লাস্টিকের ঘর আটকে দেব কী করে ?"

অফিসের জামাকাপড় ছেড়ে বাবা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিয়েছেন। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বেতের চেয়ারে আরাম করে বসে বললেন, "কুমিরের পিঠে প্লাস্টিকের ঘর বানাতে যাচ্ছিস কেন তুই ?"

"বারে ! তাহ'লে আমি সমুদ্র পেরিয়ে বাড়ি ফিরব কেমন করে !"

বুবুর কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না তার বাবা। কী যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগে মা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই প্রসঙ্গ ঘুরে গেল অন্যদিকে। চা খেতে খেতে গল্প জুড়লেন মা'র সঙ্গে।

গরমকাল, আকাশে দিনের আলো থাকে অনেকক্ষণ। বুবু সেই আলোয় জানলার ধারে বসে রাফ খাতায় গল্প লিখতে শুরু করে দিল। গল্পটা এইরকম :—

'আমাদের জাহাজ সমুদ্রে ভেসে চলেছে। নীল সমুদ্র। হঠাৎ ঝড় উঠল। ভীষণ ঝড়। ঝড়ে সমুদ্র ভয়ংকর হয়ে উঠল। তারপর একটা ডুবো পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজটা ভেঙে গেল একদম। ওই তুফানের মধ্যে সাঁতার কাটা যায় না। কিন্তু অনেক কষ্ট করে আমি সাঁতার কেটে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠলাম। জাহাজের আর কেউ বাঁচেনি। আমি শুধু একাই বেঁচেছি। দ্বীপে আর একটাও লোক নেই। পরদিন ঝড় থেমে গেল। দেখি, আমাদের ভাঙা জাহাজটা কাত হয়ে পড়ে আছে একটু দূরে। আমি সেই ভাঙা জাহাজ থেকে কয়েকটা দরকারী জিনিস নিয়ে এলাম। দ্বীপে একা-একা আমার দিন কাটতে লাগল। কিন্তু কী করে আমি বাড়ি ফিরব ? বাড়ির জন্যে আমার ভীষণ মন-কেমন করতে লাগল। এমন সময় আমি একটা কুমিরের বাচ্চা পেলাম। বাচ্চাটা তীরে

ভেসে এসেছিল। দ্বীপের মধ্যে একটা মিষ্টি জলের পুকুর ছিল। সেই পুকুরে আমি পুষতে লাগলাম কুমিরের বাচ্চাটাকে। কুমিরটা দেখতে-দেখতে বিরাট হয়ে গেল। প্রায় দশফুট লম্বা। ওকে দেখে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল একদিন। ঠিক করলাম আমার পোষা কুমিরটার পিঠে চেপে আমি বাড়ি ফিরব। কুমিরের পিঠে আমি প্লাস্টিকের একটা ছোট ঘর বানালাম। সেই ঘরে আমি আমার খাওয়ার জন্যে অনেক ফল নিলাম। আর কুমিরের খাওয়ার জন্যে নিলাম অনেক মাছ।'

বুবু এই পর্যন্ত লেখার পরে দিনের শেষ আলো লালচে হয়ে মিলিয়ে গেল হঠাৎ। ও উঠে এসে আলো জ্বালল ঘরের। মা এখন রান্নাঘরে। বাবা বেতের চেয়ারে আধ-শোওয়া অবস্থায় বসে চোখ বুজে ছিলেন। আলো জ্বালতেই চোখ খুলে বুবুকে বললেন, "কী ব্যাপার, তুই তো আজ দারুণ গুড্ বয় হয়ে গিয়েছিস। পড়াশুনোয় খুব মন।"

বাবার কথায় লজ্জা পেয়ে গিয়ে বুবু আসল কথাটা বলে ফেলল এবার। শুনে বাবা বললেন, "তুই তো তাহলে একেবারে লেখক হয়ে গিয়েছিস। নিয়ায় তো দেখি কতটা লেখা হল।"

বুবু দৌড়ে গিয়ে খাতাটা নিয়ে এল বাবার কাছে। বাবা লেখা পড়ে বললেন, "বাহ্! ভারী সুন্দর হচ্ছে তো, কিন্তু কুমিরের পিঠে ঘরটা আটকে থাকবে কী করে?"

চিন্তায় পড়ল বুবু। তাই তো! কিন্তু দুশ্চিন্তা বেশিক্ষণ থাকল না। একটু বাদেই বলল, "চিউইংগাম দিয়ে আমি ঘরটা লাগিয়ে দেব কুমিরের পিঠের সঙ্গে!"

বাবা চোখ বড়-বড় করে তারিফ করার ভঙ্গিতে বললেন, "উরিব্বাস! কিন্তু কুমিরের জন্যে আলাদা করে মাছ নিয়ে যাওয়ার কী দরকার? সমুদ্রের জলেই তো অনেক মাছ পাবে কুমির।"

বাবার অজ্ঞতায় এবার একটু বাঁকা করে তাকিয়ে বুবু বলল, "সমুদ্রের মাছ খেতে গেলে কুমিরকে জলে ডুব দিতে হবে তো?"

"তা-তো বটেই ৷"

"ডুব দিলে পিঠে বানানো ঘরটা ডুবে যাবে, সেই সঙ্গে আমিও ডুবব।"

"ঠিক-ঠিক। কিন্তু সঙ্গে মাছ থাকলে, আর সেই মাছ কুমিরকে খেতে দিলে, কুমিরের আর জলে ডুব দেবার দরকার হবে না। কুমিরের পিঠে বানানো ঘরটা তাহলে আর ডুববে না, তোকেও আর বিপদে পড়তে হবে না। ঠিক-ঠিক, দারুণ বুদ্ধি তো তোর!"

বাবার পিঠচাপড়ানি খেয়ে বুবু আবার লিখতে বসে গেল। একটু লেখে, আর অনেকক্ষণ ধরে ভাবে, আবার একটুখানি লেখে। মাঝখানে ওর মা ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে রাত্তিরের খাওয়া খাইয়ে দিলেন।

অন্যান্য দিন খেতে-খেতে ঘুমে চোখ জুড়ে যায় বুবুর। কিন্তু আজ ও চোখ খোলা রেখে চটপট খেয়ে এসে আবার লিখতে বসে গেল। তারপর আরও কিছুক্ষণ লেখার পরে শেষ হল ওর গল্প লেখা। শেষ হতেই ও ছুটে এসে বাবাকে বলল, "বাবা, আমার গল্প শেষ, দেখ তো ঠিক হয়েছে কি না।"

বুবুর বাবা প্রায়ই অফিসের কাজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। চা-টা খেয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বসে যান সেইসব কাজ করতে। কাজ মানে অঙ্ক, লম্বা-লম্বা অঙ্ক। স্কুলের পড়াশুনো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বাবা ছাড়া আর কাউকে বুবু অঙ্ক কষতে দেখেনি।

বাবা একটা বিচ্ছিরি মোটা হলুদ রঙের ফাইল খুলে অঙ্ক কষছিলেন মন দিয়ে। বুবুর কথা শুনে বাবা 'উঁ' বললেন, কিন্তু ও পরিষ্কার বুঝতে পারল, কথাটা বাবার কানেই যায়নি। একই কথা বুবু আবার বলল, তবে এবার একটু জোরে।

বাবা অঙ্ক কষতে কষতে বললেন, "ঠিক আছে, তুমি রিভাইজ করো, আমি একটু পরে দেখছি।"

বুবু খুব ভাল করেই জানে, বাবা অঙ্ক কষতে-কষতে অন্য দিকে মন দেন না কিছুতেই। সুতরাং বেচারা মন খারাপ করে ওদিকের

সোফায় বসে নিজের লেখা গল্পটা পড়তে শুরু করে দিল।

একবার পড়ল, দু'বার পড়ল, তারপর তিনবারের বার পড়তে গিয়ে ঘুমিয়েই পড়ল বুবু। ওর আর দোষ কী, রাত তো কম হয়নি !

অঙ্ক-টঙ্ক কষা শেষ হবার পরে ওর বাবা এদিকে তাকিয়ে দেখলেন, বুবু ঘুমিয়ে পড়েছে সোফার ওপর। পাখার হাওয়ায় ওর পাশে পড়ে থাকা রাফখাতার পাতা উড়ছে ফরফর করে।

বাবা উঠে এসে ওর রাফখাতাটা তুলে নিলেন। তারপর সেই গল্পটা খুঁজে নিয়ে যতটা পড়া হয়েছিল, তারপর থেকে পড়তে শুরু করে দিলেন এক মনে। বুবু লিখেছে :—

বলতে ভুলে গিয়েছি, প্লাস্টিকের ঘরটা আমি চিউয়িংগাম দিয়ে কুমিরের পিঠের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম। আমার পোষা কুমির আমাকে পিঠে চাপিয়ে সমুদ্রের ওপর ভেসে চলল। আমার খিদে পেলে আমি ফল খাই। কুমিরকে দিই মাছ। মাছ খেয়ে কুমির চলতে থাকে আবার। এইভাবে সাত, দিন সাত রাত কেটে গেল। দূরে ভারতবর্ষ দেখা যাচ্ছে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এবার বাড়িতে ফিরতে পারব। এমন সময় ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঝড় ! ওই ঝড় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে তীরের কাছে ফেলল। তীরে ছিল জেলেদের জাল। সেই জালে আটকে গেলাম আমরা। জেলেরা জাল টেনে আমাদের ডাঙায় তুলল। তারপর হল এক বিপদ। জেলেরা লাঠি নিয়ে মারতে এল কুমিরকে। আমি দৌড়ে গিয়ে বললাম, ওকে মেরো না, ও আমার পোষা কুমির। ও কত দূরের দ্বীপ থেকে পিঠে চাপিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। তাই শুনে জেলেরা খুব খুশি হয়ে অনেক, মাছ খেতে দিল কুমিরকে। কুমির পেট ভরে অনেক মাছ খেল কচমচ করে। আমি তখন বললাম, 'কুমির আমি এবার বাড়ি যাব। তুমি যাও জলে।' আবার যখন আমার বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হবে তোমাকে ডাকব !

'কুমির মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। তারপর জলে নেমে গেল। আমি অনেকদিন পরে ফিরে এলাম আমাদের বাড়িতে।'

গল্পটা পড়া হয়ে গেলে বাবা বুবুকে কোলে করে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

সেই রাত্তিরে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে বুবু 'কুমির-কুমির' বলে চেঁচিয়ে উঠল। মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "বেচারা কুমিরের স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে!"

বাবা হেসে উঠে উত্তর দিলেন, "উহুঁ, ও ভয় পায়নি। ও এখন কুমিরের পিঠে চেপে সমুদ্রে বেড়াচ্ছে।"

"তার মানে?"

মা তো আর বুবুর গল্প পড়েননি, তাই আসল ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না। বাবাও কিছু ভাঙলেন না তক্ষুণি-তক্ষুণি, লম্বা একটা হাই তুলে শুধু বললেন, "মানেটা, তুমি কাল সকালেই জানতে পারবে।"

———



মরলে বাঁচি

খোকনকে দেখে রিন্টু হৈ-হৈ করে উঠল। তারপরেই বলল, "চল ছাতে চল, ক্রিকেট খেলব, বাবা আমাকে নতুন ব্যাট-বল কিনে দিয়েছে।"

কথাটা কানে যেতেই রিন্টুর মা বললেন, "কক্ষনো না, এই দুপুর রোদ্দুরে কেউ ছাতে যাবে না। খোকন কদ্দিন বাদে তোমাদের বাড়ি এল, যাও না ওর সঙ্গে বসে একটু গল্প-টল্প করো।"

ক্রিকেট খেলাটা ভেস্তে যেতেই মন খারাপ হল রিন্টুর। ও মুখ শুকনো করে বলল, "কী গল্প করব, বসে-বসে গল্প তো শুধু বড়রা করে।"

শুনে কাকীমা হেসে উঠে বললেন, "ঠিক বলেছ, বসে-বসে গল্প শুধু বড়রাই করে। তোমরা বসে-বসে খেলবে, এসো তোমাদের একটা মজার খেলা শিখিয়ে দিই।"

মজার খেলার কথা শুনে রিন্টুর শুকনো মুখ আবার ঝলমলে হয়ে উঠল। কোণের ঘরে ওদের নিয়ে এসে কাকীমা বললেন, "একজন প্রথমে একটা দেশের নাম বলবে। যেমন ধরো ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়ার

শেষে কোন্ অক্ষর আছে ? 'এ'। এবার আর একজন 'এ' দিয়ে আর একটা দেশের নাম বলো।"

খোকন চটপট বলল, "আফ্রিকা।"

"গুড। আফ্রিকার শেষেও 'এ'। রিণ্টু তুমি এবার বলো।"

রিণ্টু কপালে ভাঁজ ফেলে ভাবতে শুরু করল।

খোকন ছটফট করে বলল, "আমি বলব, আমি বলব 'এ' দিয়ে আমার অনেকগুলো দেশের নাম মনে পড়ে গেছে!"

কাকীমা চোখ নাচিয়ে নিষেধ করে বললেন, "না না, এবার রিণ্টু বলবে, বলো রিণ্টু।"

হঠাৎ পটপট করে রিণ্টুর ছোট্ট কপালের ভাঁজগুলো মিলিয়ে গেল এক্কেবারে। ও চেঁচিয়ে উঠে বলল, "অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়া।"

"ভেরি গুড। এ খেলাটা বেশ মজার, না ?"

"হ্যাঁ, দারুণ!"

"তাহলে তোমরা বসে-বসে খেল। জিতলে এক পয়েন্ট, হারলে গোল্লা, দশে গেম।"

কাকীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় রুমকি বায়না ধরল, "আমিও খেলব।"

"বেশ তো খেল না। তোমরা রুমকিকেও দলে নিয়ে নাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি তুলল রিণ্টু, "ওইটুকু মেয়ে, ও পারবে না।"

শুনে ভীষণ রাগ হয়ে গেল রুমকির। "খুব পারব, কেন পারব না, তোমরা কী এমন বড় ? আহা রে!"

"বড় না ? আমরা ক্লাস ফোরে পড়ি, আর তুই পড়িস ক্লাস ওয়ানে।"

চোখ ছলছল করে উঠল রুমকির। "তা হোক গে, তোমাদের স্কুলের চাইতে আমাদের স্কুল অনেক ভাল।"

রুমকির কথা শুনে ঠাট্টার গলায় হেসে উঠল খোকন আর রিণ্টু।

আর একটু হলেই রুমকির চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গালে গড়িয়ে পড়ত। কাকীমা তাড়াতাড়ি বললেন, "রুমকি ঠিকই বলেছে,

অনেক সময় উঁচু ক্লাসকে নিচু ক্লাস হারিয়ে দেয়। তোমরা রুমকিকে দলে নাও। ও পারলে পারবে, না পারলে পারবে না। এটা তো খেলা, খেলায় হারজিত থাকেই।"

কাকীমা চলে যেতেই খোকন বলল, "আমি শুরু করছি তাহলে। চায়না। শেষে আবার এ।"

"আমেরিকা।" এবার রিণ্টু বেশ চটপট উত্তর দিল। আবার এ।

রুমকি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, "আমি বলছি, এতে অ্যাপেল, অ্যাণ্ড, অ্যাণ্ট।"

শুনে হা-হা, হি-হি করে হেসে উঠল রিণ্টু আর খোকন। রুমকি রেগে গিয়ে বলল, "তোমরা বোকার মত হাসছ কেন।"

"হাসব না? অ্যাপেল কী দেশের নাম?"

"অ্যাণ্ড আর অ্যাণ্ট দেশদুটো কোথায় রে রুমকি?"

খোকন আর রিণ্টুর হাসি, প্রশ্নের কোনো মানে বার করতে পারল না রুমকি। ওদের স্কুলে এ-বি-সি-ডি দিয়ে ওয়ার্ড-মেকিং শিখিয়েছে। এ-তে অ্যাপেল তো হয়ই, অ্যাণ্ড, অ্যাণ্টও হয়। তবু ওরা হাসছে কেন? নিশ্চয়ই ওকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্যে। রেগেও গেল রুমকি, রেগে গুম হয়ে থাকল।

খেলাটা চলতে লাগল খোকন আর রিণ্টুর মধ্যে। কিন্তু দেশের নামগুলো এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল যে, রিণ্টু বলল, "একটা ধাঁধার উত্তর দে তো। তিন অক্ষরের নাম, প্রথম অক্ষরটা ছেড়ে দিলে একটা খাবারের নাম হয়, শেষের অক্ষরটা বাদ দিলে একটা বিষাক্ত প্রাণী হয়, আর—।"

"জানি-জানি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে খোকন বলল, "বিছানা। এ ধাঁধাটা বাচ্চা ছেলেরাও জানে। তুই এমন একটা টেবিলের নাম বল তো, যার কোনো পায়া নেই।"

"ধ্যুর, এটা কোনো ধাঁধাই হল না, রুমকির চেয়ে বাচ্চা মেয়েরাও এর উত্তর জানে। টাইম টেবিল।"

রিণ্টুর কথায় হিন্দু স্কুলের ফার্স্ট বয় খোকন চটে গিয়ে বলল,

'আচ্ছা বল্ তো নীল নদের দৈর্ঘ্য কত ?”

রেগে গেল ক্যালকাটা বয়েজের সেকেণ্ড বয় রিন্টুও। মুখ লাল করে জিজ্ঞেস করল, “তুই বল্ তো এস্কিমোদের বাড়ির নাম কী ?”

“তুই 'মূলোচ্ছেদ' সন্ধি বিচ্ছেদ কর তো।”

“নাউন্‌স হ্যাট হ্যাভ নো প্লুরাল ফর্মস—এগজাম্পল দে।”

“বল্ তো জলপথে ভারতে আসার পথ কে আবিষ্কার করেছিল ?”

“ইউরোপে মরুভূমি আছে কী না বল্ তো ?”

প্রতিটি প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনেরই গলার স্বর ওপর দিকে উঠতে লাগল। হঠাৎ ওদের গলার স্বর ছাপিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল রুমকি। বেশ একচোট নিজের মনে হেসে নেওয়ার পরে বলল, “কেউ কিচ্ছু জানে না। দুজনেই খালি প্রশ্ন করে যাচ্ছে, উত্তর দেবার বেলায় লবড়ংকা। এবার আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দাও তো দেখি।”

রুমকি দুটো ছোট্ট বিনুনি ঘাড়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, “আচ্ছা বল্ তো মা কখন বলে, আর পারি না বাবা, মরলে বাঁচি।”

খোকন ভ্রূ কুচকে বলল, “এটা আবার কী ধরনের প্রশ্ন! এরকম কথা তো মা-রা যখন-তখন বলতে পারে, বলেও।”

“হল না, তুই ?”

“মরলে বাঁচি মানে মরে গেলে ভাল হয়। এ-কথা বলার আবার সময় আছে না কি, যখন খুশি বললেই বলা যায়।”

“হল না হল, না” রুমকি চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ঠিক বড়দের মতো মুখ করে বলল, “মা যখন বাবার ওপর খুব রেগে যায়, তখন এই ধরনের কথা বলে। মা কিন্তু সত্যি-সত্যি মরতে চায় না। আচ্ছা; এবার বল তো ঠাকুমা কখন বাবাকে বলে, তুই আমাকে কাশী রেখে আয়।”

“কাশী যাওয়ার ইচ্ছে হলে।”

“কচু। বাবার ওপর রাগ হলে ঠাকুমা কাশী যাওয়ার কথা বলে।” রুমকির উত্তর শুনে রিন্টু আর খোকন দুজনেরই মুখ একটু গম্ভীর

হয়ে গেল। জিতে যাওয়ার আনন্দে রুমকির চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করছিল। ও এবার বলল, 'আমাদের একটুও দোষ না থাকলেও মা কখন আমাদের দুম-দুম করে মারে বল তো?"

এই ঘটনাটা এতই সত্যি আর করুণ যে একটুও মাথা না খাটিয়ে দুজনেই ভালমানুষের মতো জিজ্ঞেস করল "কখন?"

"মার যখন বাবা-ঠাকুমা সবার ওপর রাগ হয়ে যায়, তখন।"

রুমকি আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় কাকীমা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, খেলার কী খবর? কে জিতল?"

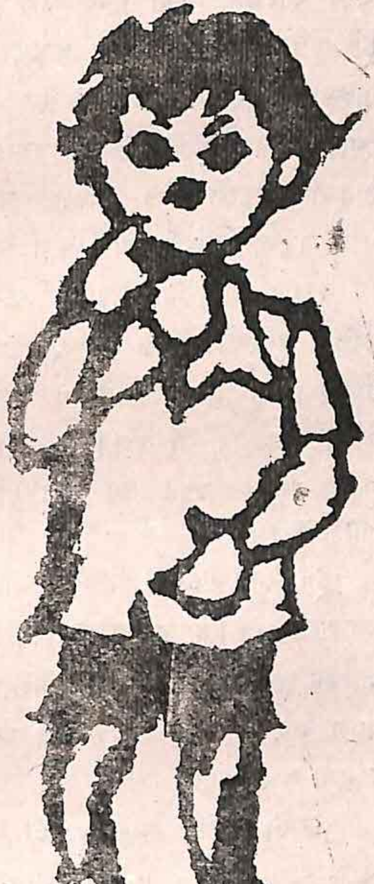
রুমকি লাফিয়ে উঠে বলল, "আমি আমি, আমি জিতেছি।"

কাকীমা তখন হাসি-হাসি মুখে রিণ্টু আর খোকনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তাই নাকি?"

শুনে রিণ্টু-খোকনের থমথমে মুখ আরও থমথমে হয়ে গেল। ওরা একটাও কথা না বলে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

———

টুবাইয়ের ছেলেবেলা



টুবাইয়ের ছোটদাদু প্রত রোববার টুবাইদের বাড়িতে আসেন। এলেই মা কফি করে দেন, কফির সঙ্গে থাকে আলুভাজা আর কড়া পাকের সন্দেশ। সন্দেশ, আলুভাজা আর কফি খেয়ে ছোটদাদু মুখ মুছে একটা বড় চুরুট ধরান। চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর একটু আবছা-আবছা হয়ে গেলেই ছোটদাদু পায়ের ওপর পা তুলে গল্প জুড়ে দেন।

সে কত গল্প, গল্পের আর শেষ নেই। মা, ঠাকুমা, বাবা, কাকু আর মিনতিদি সব কাজ ফেলে সেই গল্প শোনেন। আগে টুবাই এসব গল্প শুনত না, শুনলেও ঠিক বুঝত না। এখন শোনে, শুনতে বেশ মজা লাগে। চার বছরের টুবাই গম্ভীর চালে বড়দের মতো মুখ করে গল্প শোনে।

বড়রা যখন হাসে, ও-ও তখন হাসে। বড়রা যখন চুপ করে, ও-ও তখন চুপ করে। বাইরের মাঠে খোকন, বুবু, মাধু, টুকুরা খেলা করে, কিন্তু টুবাই গল্প শোনার সময় সেখানে যেতে চায় না।

ছোটদাদু এ-গল্প সে-গল্পের শেষে ছেলেবেলার গল্প শুরু করেন। এই গল্পগুলো শুনতে টুবাইয়ের সবচাইতে ভাল লাগে। ছেলেবেলায়

মা কেমন দুষ্টুমি করত, বাবা কেমন বকুনি খেত, ঠাকুমা কেমন করে পুতুল খেলত—এসব গল্প শুনতে কার না মজা লাগে!

কাকু এখন কত বড়, অথচ এই কাকু ছোটবেলায় শুধু ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদত। বাবা যখন ঠিক টুবাইয়ের মতো তখন দুপুরবেলায় চুপি-চুপি ন্যাড়া ছাতে ঘুড়ি ওড়াতে চলে যেত। একদিন না……! এইভাবে ছোটদাদু গল্প করলে সবাই হাসি-হাসি মুখ করে গল্প শোনে, আর টুবাই শোনে চোখ বড়-বড় করে। একদিন না ঠাকুমার পুতুলের বর হারিয়ে যায়, তখন ঠাকুমার যে কী কান্নাকাটি! তাই না দেখে ঠাকুমার বাবা এসে বলল……।

গল্পের এইরকম জায়গায় এসে ছোটদাদু প্রায়ই থেমে যান ইচ্ছে করে, টুকটাক অন্য কথা বলেন, কিংবা চোখ বন্ধ করে চুরুট টানেন। টুবাই তখন ভীষণ অধৈর্য হয়ে পড়ে। বারবার বলতে থাকে, তারপর কী হল? ও দাদু, বলো না, তারপর কী হল? বলতে-বলতে যখন ওর গলা ধরে আসে, তখন ছোটদাদু আবার গল্প শুরু করেন।

টুবাইদের বাড়িতে অনেকগুলো ছবির অ্যালবাম আছে। কয়েকটা অ্যালবামে আছে রাজ্যের পুরনো ছবি। ছবিগুলো হলুদ হয়ে গেছে, লালচে হয়ে গেছে, কিন্তু ওই ছবিগুলোই দেখতে টুবাইয়ের সব চাইতে ভাল লাগে। ওই ছবিগুলোর মধ্যেই আছে ছেলেবেলার মা, বাবা, ঠাকুমা আর কাকু।

একটা ছবিতে বাবা একটা ছোট্ট কাঠের বাক্সের ওপর চুপটি করে বসে আছে। বাবার গায়ে একটা গেঞ্জি, পরনে এইটুকু একটা প্যান্ট। পাশেই পেয়ারা গাছ, গাছে এত বড়-বড় পেয়ারা। আর একটা ছবিতে একটা ছোট মেয়ে ফ্রক পরে বারান্দার রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ওই রোগা, ছোট মেয়েটাই নাকি টুবাইয়ের মা, ছেলেবেলায় মাকে কীরকম যেন দেখতে ছিল। অন্য একটা ছবিতে ছোটখাটো গোলগাল একটা ছেলে অনেকগুলো বেলুন হাতে নিয়ে দাঁত বার করে হাসছে। দাঁতগুলো কী বড়-বড় আর ফাঁক-ফাঁক। এই

ছেলেটাই নাকি ছেলেবেলার ছোট্টকাকু। দেখলে বিশ্বাসই হয় না।

ছোটকাকু এখন কত বড়, বাবার চাইতেও বড় দেখায়। মোটা গলা, ধমক দিলে টুবাইয়ের বুক কেঁপে ওঠে। বড়দের ছেলেবেলার ছবি দেখতে টুবাইয়ের খুব ভাল লাগে। মা আলমারি খুললে ও পুরনো ছবির অ্যালবাম টেনে নেয়, আর বারবার, বারবার ছবিগুলো দেখে। দেখে-দেখে ওর আশই মেটে না।

একদিন টুবাই ছবিগুলো দেখতে-দেখতে বলল, "মা, আমার ছেলেবেলার ছবি নেই? আমার ছেলেবেলার ছবি দেখাও না?"

মা হেসে বলল, "তোমার তো ছেলেবেলার অনেক ছবি আছে, তুমি তো দেখেছ ছবিগুলো! আবার দেখবে, ঠিক আছে, দেখ।" মা আলমারি থেকে দুটো অ্যালবাম বার করে টুবাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, দেখ। সব ছবি তোমার ছেলেবেলার!"

অ্যালবামের পাতা উলটে টুবাই বলল, "এ তো মা আমার এখনকার ছবি, আমার ছেলেবেলার ছবি কোথায় মা?"

মা হাসতে-হাসতে বলল, "তুমি যখন আমাদের মতো বড় হবে, তখন এই ছবিগুলোই তোমার ছেলেবেলার ছবি হয়ে যাবে।"

উত্তরটা টুবাইয়ের একদম ভাল লাগল না। এ আবার কেমন কথা হল! তোমাদের সবার ছেলেবেলার ছবি আছে, আমারটা তাহলে থাকবে না কেন?

পরের রবিবার ছোটদাদু আসতেই টুবাই ছুটে দাদুর কাছে গেল। মা গেছে কফি আর আলু ভাজতে। একটু পরেই এক-এক করে সবাই এখানে গল্প শুনতে হাজির হবে।

দাদুকে একা পেয়ে টুবাই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ছোটদাদু, তুমি বাবা, মা, ঠাকুমা, কাকু সবার ছেলেবেলার গল্প করো, আমার ছেলেবেলার গল্প করো না কেন? আজ তোমাকে আমার ছেলেবেলার গল্প করতে হবে।"

"তোমার ছেলেবেলা!" বলেই দাদু হা-হা-হা-হা করে হাসতে লাগল, তারপর চিৎকার করে বলল, "তোমরা শুনে যাও, টুবাই কী

বলছে।”

মা, বাবা, ঠাকুমা, কাকু ঘরে এলে দাদু আবার বেশ কিছুক্ষণ হা-হা-হা-হা করে হেসে নিয়ে বলল, “শোনো টুবাইয়ের কথা। আমি তোমাদের ছেলেবেলার গল্প করি, অথচ টুবাইবাবুর ছেলেবেলার গল্প করি না বলে ওর খুব রাগ হয়েছে! ও এখন এসে আমাকে ধরেছে ওর ছেলেবেলার গল্প বলার জন্যে।”

দাদুর কথা শুনে ঘরের সবাই হো-হো, হা-হা, হি-হি করে হেসে উঠল। সকলের হাসি শুনে টুবাইয়ের রাগ হয়ে গেল খুব। এতে হাসির কী আছে? তোমাদের ছেলেবেলা আছে, আর আমার ছেলেবেলা নেই!

রাগ করে টুবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সবাই কত ডাকল, কিন্তু ও আর ফিরল না। ও চলে গেল বাড়ির সামনের খেলার মাঠে। ওখানে টুকু, মাধু, বুবু আর খোকন চোর-চোর খেলছে। ও গিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিল। খেলতে-খেলতে হাঁপিয়ে গেলে ওরা মাঠের ওপর বসল গোল হয়ে।

একটু পরেই টুবাই গল্প জুড়ে দিল—“ছেলেবেলায় আমরা অ-নে-ক দূরে একটা পাহাড়ের কাছে থাকতাম। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ট্রেন যেত কু-ঝিক-ঝিক, কু-ঝিক-ঝিক করে। ট্রেন চলে গেলে আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যেতাম। পাহাড়ে নদী ছিল। অ-নে-ক বড় নদী। নদীতে কত মাছ থাকত। বাবা মাছ ধরত, মা রান্না করত। আমরা খেতাম। খেয়েদেয়ে ফুটবল খেলতাম। ছেলেবেলা তো, বাবা তখন এইটুকুন ছিল, মা তখন এইটুকুন ছিল, আমিও ছিলাম এইটুকু। ফুটবল খেলে, নদীতে সাঁতার কেটে গাড়িতে চেপে ভোঁ করে করে বাড়িতে চলে আসতাম। ঠাকুমা তখন বাড়ীর মধ্যে পুতুল খেলত।”

ছোটদাদুর গল্পের সঙ্গে নিজের বানানো গল্প জুড়ে দিয়ে টুবাই দিব্যি ছেলেবেলার গল্প বলে গেল! বন্ধুরা শুনল হাঁ করে। গল্পের শেষে টুবাই বলল, “সন্ধে হয়ে যাচ্ছে, এবার আমি বাড়ি যাব। কাল এসে আবার তোদের ছেলেবেলার গল্প বলব।”

টুবাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধুরাও উঠে পড়ল, তারপর সবাই চলে গেল যে-যার বাড়ি।

সন্ধেবেলায় টুবাই মায়ের কাছে পড়াশুনো করে। 'অ'-য় অজগর আসছে তেড়ে, 'এ' ফর অ্যাপেল, খোকন গেছে মাছ ধরতে—এইসব। আজ পড়তে-পড়তে টুবাই বলল, "মা, ছেলেবেলায় না আমি অন্যরকম বই পড়তাম। একদিন দুষ্টুমি করে বই ছিঁড়ে ফেলেছিলাম বলে তুমি আমাকে পাহাড়ের কাছে গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে না? মনে আছে তোমার? তুমি তখন কত ছোট ছিলে। বেড়াল দেখলে ভয় পেতে।"

শুনে মা হাসতে-হাসতে বলল, "ও-মা! ছেলেবেলার এত কথা তোমার মনে আছে?"

টুবাই হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, ছেলেবেলার সব কথা আমার মনে আছে। ছোটদাদুর মনে নেই। ছোটদাদু তখন খুব ছোট্ট ছিল তো, সেই জন্যে।"

"উরিব্বাস! ছোটদাদুর ছেলেবেলার কথাও তোমার মনে আছে?"

"আছে।"

"কী রকম?"

"ছোটদাদু তখন ছোট্ট ছিল। ছোট্ট লাঠি নিয়ে হাঁটত। ছোট্ট-ছোট্ট চুরুট খেত।" টুবাইয়ের কথা শুনে মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, "সামনের রোববার ছোটদাদু এলে তুমি দাদুর সামনে দাদুর ছেলেবেলার গল্প শুনিয়ে দিও, কেমন?"

টুবাই বড়দের মতো ভঙ্গি করে বলল, "আচ্ছা।"

———



ঝুমুর

সব্বাই বলে, হাসপাতালে গেলে সব্বাই রোগা আর কালো হয়ে যায়। কিন্তু কই, মা তো রোগাও হয়নি, কালোও হয়নি। বরং মাকে কেমন যেন নতুন-নতুন লাগছে। হাসপাতালের সাদা বিছানায় মা বসে আছে পিঠে বালিশ দিয়ে। পায়ের শব্দে মা তাকিয়ে দেখে, অমু। আর অমু দেখে, মায়ের মুখে হাসি। হাসি দেখেই ওর ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু না, পেছনে আছে মাসী, পিসী আর ছোটকাকু। মায়ের আদর খেতে দেখলে সবাই হেসে উঠবে। তা ছাড়া অমু তো এখন বড়, বড় না?

মায়ের বিছানার তিনদিকে চেয়ার পেতে বসল সবাই। রাঙা পিসী চেয়ার থেকে একটু সরে গিয়ে অমুকে বলল, "তুই এখানে বোস্।"

অমু নিজেকে বড়দের মতো ভাবছিল, তাই গম্ভীর হয়ে বলল, "না-মা, তুমি বোসো।" মনে-মনে বলল, "আহা, বড়রা বুঝি ওইটুকু জায়গায় বসতে পারে!"

ঘরটা কী বিরাট! অমু গুনে দেখল, ঘরে সবশুদ্ধ কুড়িটা খাট পাতা। সব খাটেই কেউ না কেউ শুয়ে কিংবা বসে। প্রায় সবার কাছেই বাড়ির লোক। সবাই গল্প করছে, তবে খুব নিচু গলায়। এখানে কি জোরে কথা বলা বারণ? হতে পারে, তবে জোরে হাঁটায় বোধহয় নিষেধ নেই। সিস্টাররা সাঁ-সাঁ করে হাঁটছে। অমু হাসপাতালে আসার আগেও সিস্টার দেখেছে। অন্তুর দিদি সন্ধ্যাদিই তো সিস্টার। ঠিক এইরকম জামাকাপড় আর টুপি পরে। কী ভাল লাগে দেখতে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কবিতাটা পড়ে অমুরও সিস্টার হবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কী করে হবে, ছেলেরা তো আর সিস্টার হতে পারে না!

হঠাৎ সামনের ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল এক সিস্টার, হাতে ইনজেকশন দেবার সিরিঞ্জ। ইনজেকশন দেবার আগে পিচকিরির মতো একটুখানি জল ছিটিয়ে দেওয়া দেখতে অমুর খুব ভাল লাগে, কিন্তু ছুঁচ ফোটানোটা বিচ্ছিরি। পনেরো নম্বর বেডের বউটির হাতে ছুঁচ ঠেকাতে না ঠেকাতেই তিনি "উঃ লাগছে, লাগছে, ভীষণ লাগছে" বলে চিৎকার করে উঠলেন। চিৎকার শুনে সবাই তাকাল ওঁর দিকে। আর ঠিক তক্ষুনি কে-যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। অমু তাকিয়ে দেখল মায়ের ঠিক পাশের বেডের ছোট্ট মেয়েটা। খিলখিল করে হাসছে, আর হাসির ফাঁকে-ফাঁকে ওই বউটার গলা নকল কয়ে বলছে "উঃ লাগছে, লাগছে, ভীষণ লাগছে।" কেউ কষ্ট পেলে অমুর খুব কষ্ট হয়। আর কেউ যদি কারও কষ্ট পাওয়া নিয়ে মজা করে, তাহলে তার ওপর অমুর রাগ হয়ে যায় ভীষণ। এখন যেমন এই মেয়েটার ওপর ও চটে গেল। মেয়েটার হাসি আর থামে না, হাসছে তো হাসছেই।

মা চাপা গলায় মেয়েটাকে ধমক দিয়ে বলল, "এই ঝুমুর, কী,

হচ্ছে কী! চুপ কর, চুপ কর বলছি। চুপ করবে না? আমি তাহলে আর তোমার মা হব না।"

শেষের কথাটা বলতেই মেয়েটা হাসি থামিয়ে একদম চুপ করে গেল।

মা পিঠের বালিশটা একটু উঁচু করে কোলের ওপর দুহাত রেখে বসল। তারপর বাঁ-হাতের পাঁচ আঙুলে ডান-হাতের পাঁচ আঙুল ঢুকিয়ে নিচু গলায় বলল, "উফ্! এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা যায় না!" মায়ের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে গেলে আর গলার স্বর নিচু হলেই অমু বুঝতে পারে, এক্ষুনি একটা গল্প শুরু হবে। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে রাঙা পিসীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

মা বলল, "সত্যি, মেয়েটার জন্যে ভীষণ কষ্ট হয়। জন্মের পর থেকে মেয়েটা হাসপাতালেই আছে। কী যে অসুখ ভগবান জানে! না পারে উঠতে, না পারে বসতে, এমন কী নিজে-নিজে পাশ ফিরতেও পারে না। শুয়ে-শুয়েই মেয়েটা এত বড় হয়ে উঠেছে। পাঁচ-ছ বছর বয়েস পর্যন্ত কথা বলতে পারত না। অথচ মেয়েটা শুনেছি রাজার ঘরে জন্মেছে। বাবা বিরাট বড়লোক, এখন অবিশ্যি বিদেশে থাকে। মা নেই। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের তো মাঝে-মধ্যে ওকে দেখে যাওয়া উচিত! কেউ আসে না ওর কাছে, অথচ আর সবার কাছে কত লোক আসে রোজ। ওর বাবা হাসপাতালে অনেক টাকা দিয়েছে, তাতেই নাকি ওর সারাজীবন চলে যাবে।

সিস্টাররাই ওর নাম রেখেছে ঝুমুর, ওরাই ওকে কথা বলতে শিখিয়েছে। মেয়েটার সব ভাল, হাসিখুশি, সবার সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলে, কিন্তু ওই এক দোষ—কেউ কষ্ট পেলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে আর মজা করে। সবাই তো আর সহ্য করতে পারে না, অনেকেই ওর নামে ডাক্তারবাবুদের কাছে নালিশ করেছে। ডাক্তারবাবুরা তাই ঠিক করেছেন, ওকে এবার একটা আলাদা ঘরে সরিয়ে দেবেন। আলাদা মানে একেবারে আলাদা। সে-ঘরে ও ছাড়া আর কেউ থাকবে না। সে কথা শুনে ওর কী কান্না!

বলে, একা থাকলে আমি কার সঙ্গে কথা বলব, আর কথা বলতে না পারলে আমার কষ্ট হবে, আর কষ্ট হলেই আমি মরে যাব। ওইটুকু বাচ্চা, এইসব কথা বললে কার না মন খারাপ হয়ে যায়! আমি ওকে কত বুঝিয়েছি, তুমি আর দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী হয়ে থাকো, তাহলে কেউ আর তোমাকে এ-ঘর থেকে নিয়ে যাবে না। সব শোনে, বোঝে, কিন্তু কাউকে কষ্ট পেতে দেখলেই ওর হাসি শুরু হয়ে যায়। আজ তিনদিন ধরে আমাকে আবার মা বলতে শুরু করেছে।

মা'র কথা শেষ হতেই সবাই একবার আড়চোখে ঝুমুরকে দেখে নিল। ঝুমুর শুকনো মুখ করে জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু আগেই এই মেয়েটার ওপর অমুর খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আর একটুও রাগ নেই।

মা বলল, "এই অমু, ওকে দুটো কমলালেবু দিয়ে এসো তো।" মায়ের বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটার ওপরে একগাদা ফল, ছোটকাকু আর মাসীমণি নিয়ে এসেছে। মা তার থেকে দুটো লেবু তুলে নিয়ে অমুর হাতে দিল।

অমু জানে ওর নাম ঝুমুর, কিন্তু নাম ধরে ডাকতে কেমন যেন লজ্জা করছিল, তাই ওর খাটটা ঘুরে ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুমুর জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে ছিল, হঠাৎ পাশে অমুকে দেখে অবাক হয়ে গেল। অমু বলল, "নাও, মা দিয়েছে।"

কমলালেবু হাতে নিয়ে ফিক করে হাসল ঝুমুর, তারপরে বলল, "তোমার নাম কী?"

"আমার? অমু—অমৃত মিত্র।"

"কী?"

"অমৃত।"

"এমা! কী বিচ্ছিরি নাম।"

শুনে অমু গম্ভীর হয়ে গেল। আর অমুকে গম্ভীর হতে দেখেই ঝুমুর খিল-খিল করে হেসে বলল, "তোমার নামটা বিচ্ছিরি হলে

কী হবে, তুমি খুব ভাল ছেলে। আচ্ছা, তুমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছ, সাদা বাঘ দেখেছ ? আচ্ছা, সাদা বাঘ কি সত্যি-সত্যি সাদা ?”

নামটা বিচ্ছিরি বলার জন্যে অমু ঝুমুরের ওপর একটু চটে গেলেও শেষপর্যন্ত ওর সঙ্গে অমুর খুব ভাব হয়ে গেল। ঝুমুর একটানা গল্প করতে পারে, এক কথা শেষ হতে-না-হতেই আর-এক কথায় চলে যায়। প্রথমে অমু ভেবেছিল, দু-এক কথা বলেই চলে আসবে। কিন্তু ঝুমুর কথা বলতে শুরু করে আর থামছিলই না, আর কেউ কথা না-থামালে তো উঠে আসা যায় না! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে অমু পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল, তারপরেই ওদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

এমন সময় টুং-টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টা বাজলে বাইরের লোকদের চলে যেতে হয়। অমু উঠে দাঁড়াতেই ঝুমুর বলল, “এরপর যেদিন আসবে, সেদিন একটা মজার গল্প বলব।”

অমু দুষ্টুমি করে বলল, “কী করে বলবে ?”

“কী করে আবার, যেভাবে সবাই গল্প বলে।”

“বারে, তুমি তো আমাকে দেখতেই পাবে না।”

“কেন পাব না ?”

“তোমাকে তো ডাক্তারবাবুরা অন্য ঘরে সরিয়ে দেবে।”

বলতেই ঝুমুরের মুখ শুকিয়ে এইটুকু হয়ে গেল। ও মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। আবার টুং টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠল, এবার বেশ জোরে। ছোটকাকুরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। মাসীমণি ডাকল, “অমু এসো”। ঝুমুরকে আর কিছু বলা গেল না, ওরা সবাই বেরিয়ে এল হাসপাতাল থেকে।

রাস্তায় পা দিতেই অমুর ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। ঝুমুরকে ওসব না-বললেই হত, ও হয়ত এখন কাঁদছে। মায়ের কাছে শোনা ঝুমুরের সব কথা ওর মনে পড়তে লাগল। ঝুমুরের এমনিতেই কত কষ্ট, ও শুধু-শুধু ওর কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিয়ে এল। বাড়ি ফিরে এসে ঝুমুরের কথা ওর আরও বেশি করে মনে পড়তে লাগল।

অমু একবার বাবার সঙ্গে প্লেনে চড়ে দিল্লিতে গিয়েছিল। তখন ও ঠিক করেছিল যে, বড় হয়ে পাইলট হবে। তারপর মায়ের যখন অসুখ করল, তখন ও ঠিক করল ডাক্তার হবে। ডাক্তার হয়ে সব্বার অসুখ সারিয়ে দেবে। কিন্তু ডাক্তাররা তো সবরকম অসুখ সারাতে পারে না, যদি পারত তাহলে ঝুমুরকে কবে ভাল করে দিত।

ঝুমুরকে ভাল করে দেবার জন্যে ওর একটা-কিছু হতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কী হবে? অমু বইতে পড়েছে, বিজ্ঞানীরা কত কিছু আবিষ্কার করে। আবিষ্কার করে লোকের ভাল করে। অমু ঠিক করল, বড় হয়ে ও বিজ্ঞানী হবে, হয়ে এমন কিছু একটা বার করবে, যাতে ঝুমুরের অসুখ এক্কেবারে সেরে যাবে। কিন্তু, কিন্তু বিজ্ঞানী হতে গেলে তো অনেক দেরি, তদ্দিন ঝুমুর একা-একা একটা ঘরে থাকবে কী করে! একা-একা থাকার নামেই ঝুমুরের মুখ শুকিয়ে এইটুকু হয়ে গেছে, সত্যি-সত্যি থাকতে হলে তো বেচারার খুব কষ্ট হবে।

আচ্ছা, অমু যদি বড় ডাক্তারবাবুকে বলে, ঝুমুর আর দুষ্টুমি করবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, তাহলে? কিন্তু বড় ডাক্তারবাবু যদি ওর কথা না শোনে! তাছাড়া তিনি যদি খুব রাগী-রাগী হন, গলার স্বর যদি গম্ভীর হয়, তাহলে তো এত কথা ও গুছিয়েই বলতে পারবে না তার চাইতে চিঠি লেখাই ভাল। বড় ডাক্তারবাবুর ঘরের দরজায় একটা চিঠির বাক্স আছে, সেখানে ফেলে দেবে। অমু ছাতের ঘরে বসে লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা চিঠি লিখল।

পূজনীয় বড় ডাক্তারবাবু,

আমার নাম শ্রীঅমৃত মিত্র। আমার মা আপনাদের হাসপাতালেই আছেন। মা'র বেড নম্বর দশ। এগারো নম্বরে থাকে ঝুমুর। ঝুমুর আর দুষ্টুমি করবে না। কেউ কষ্ট পেলে ও আর হাসবে না। মজা করবে না। খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। ওকে আপনি অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেবেন না। একা-একা থাকতে

ওর ভীষণ কষ্ট হবে। ও কাঁদবে, শুধু কাঁদবে। আপনি আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি—অমৃত।

চিঠিটা অমু ওর বইয়ের ব্যাগে যত্ন করে রেখে দিল।

হাসপাতালে ছোটদের রোজ-রোজ যাবার নিয়ম নেই। ছোটরা যেতে পারে শুধু রোববার আর বুধবার। কাল সোম, পরশু মঙ্গল—এই দুদিন অমুর আর কাটতেই চাইছিল না। শেষকালে বুধবার এল। দুপুরে এল মাসীরা, পিসীরা আর অনুদি। বিকেল হতে না হতেই সবাই হাসপাতালে যাবে বলে বেরিয়ে পড়ল। অনুদির সঙ্গে অমুর খুব ভাব। অমু আস্তে-আস্তে বলল, "অনুদি তুমি আমাকে একটা ক্যাডবেরি কিনে দেবে ?" অনুদি ওকে একটা ক্যাডবেরি কিনে দিল। অমু সেটা রেখে দিল ডানদিকের প্যান্টের পকেটে, বাঁ দিকের পকেটে আছে বড় ডাক্তারবাবুকে লেখা চিঠিটা।

মিনিবাসে চড়ে ওরা হাসপাতালে পৌঁছে গেল খুব তাড়াতাড়ি। মা'র কাছে যাবার পথে বড় ডাক্তারবাবুর ঘরটা পড়ে। ঘরের দরজার একটা পাল্লা খোলা। অমু দেখল ডাক্তারবাবু চেয়ারে বসে কী যেন লিখছেন, আর টেবিলের সামনে তিনজন বসে আছে চুপ করে। লিখতে-লিখতে হঠাৎ উনি একবার বাইরের দিকে তাকালেন, তাকাতেই অমুর বুকটা ঢিব্‌ঢিব্‌ করে উঠল। ওর মনে হল, পকেটের চিঠিটার কথা উনি বোধহয় টের পেয়ে গেছেন। অমু তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেল।

হাসপাতালের বারান্দাটা কী লম্বা! এত লম্বা বারান্দা ও আগে কখনো দেখেনি। হাঁটছে তো হাঁটছেই। বারান্দার একদম শেষের ঘরটায় মা থাকে।

ঘরে ঢুকে দেখে, মা সেই দিনের মতো বিছানায় বসে আছে। কিন্তু ঝুমুর কোথায় ? বিছানাটা খালি। ওকি কোথাও গেছে ? কিন্তু যাবে কী করে ? হাঁটা দূরের কথা, ও তো বসতেই পারে না। ফাঁকা বিছানা মাসীমণিরও চোখে পড়েছে। মাসীমণি মাকে জিজ্ঞেস করল, "আরে! ওই মেয়েটা কোথায় ?"

মা বলল, "আর বোলো না, মেয়েটাকে কাল অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেছে। যাবার সময় সে কী কান্না! বেচারা এখানে তবু দুটো কথা বলতে পারত, এখন আর সে সুযোগও পাবে না। একা একটা ঘরে ওই মেয়ে থাকবে কী করে!"

"ঘরটা কোথায়?"

"বারান্দার ওই কোণায়, তিন নম্বর ঘর। ভেবেছিলাম একবার দেখা করে আসব, কিন্তু অদ্দুর তো আমার হাঁটা বারণ। সামনের রোববার আমাকে ছেড়ে দেবে বলেছে, সেদিন যদি পারি একবার দেখা করে যাব।"

শুনে সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর অনুদি কী-একটা বলতেই কথা ঘুরে গেল অন্যদিকে। কতরকম গল্প হচ্ছিল, কিন্তু অমুর কিচ্ছু শুনতে ভাল লাগছিল না। ও এদিক-ওদিক হাঁটতে-হাঁটতে ঘর থেকে টুক করে বেরিয়ে পড়ল, তারপর বারান্দা ধরে এগিয়ে চলল সোজা। বারান্দার কোণের দিকে তিন নম্বর ঘর। ঘরে পর্দা ঝোলানো। পর্দায় হাত দিতেই ওর কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল, ও হাত সরিয়ে নিল। তারপর সাহস করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

ছাতের দিকে তাকিয়ে ঝুমুর চুপ করে শুয়ে ছিল। কী রোগা আর কালো হয়ে গেছে ও এর মধ্যেই। অমু খুব আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকেছে তো, তাই ঝুমুর ওর পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। ও ঝুমুরকে অবাক করে দেবার জন্যে পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল। কিন্তু একটুখানি এগোবার পরেই টের পেয়ে গেল ঝুমুর। হঠাৎ অমুকে দেখে খুশিতে ওর চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। কিন্তু অমু যেই না জিজ্ঞেস করেছে, "কেমন আছ?" অমনি ঝুমুরের দুচোখ জলে ভরে গেল। দেখতে-দেখতে ওর দু'গাল ভেসে গেল চোখের জলে। কাউকে কাঁদতে দেখলে অমুরও কান্না পেয়ে যায়, গলার ভেতরটা কেমন যেন ভার-ভার হয়ে ওঠে। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে অমুর চোখে ঠিক জল এসে যাবে। ও

পকেট থেকে ক্যাড্‌বেরিটা বার করে ঝুমুরের হাতে দিয়ে একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমুর প্যান্টের ডানদিকের পকেট এখন খালি, বাঁদিকের পকেটে আছে বড় ডাক্তারবাবুকে লেখা চিঠিটা। চিঠি হাতে নিয়ে ও এগিয়ে চলল। বড় ডাক্তারবাবুর ঘরের দরজার এক দিকটা আগের মতোই খোলা, কিন্তু ঘরে কেউ নেই। চিঠির বাক্সটা একটু উঁচুতে লাগানো। অমু যেই না চিঠিটা ফেলতে যাবে অমনি কে যেন ওর কাঁধে হাত রাখল। ও চমকে তাকিয়ে দেখে বড় ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী ফেলছিলে?"

"চিঠি।"

"কার?"

"আপনার।"

"আমার! দেখি।"

চিঠিটা হাতে দিতেই ডাক্তারবাবু আরও মোটা গলায় বললেন, "ভেতরে এসো।" ডাক্তারবাবু টেবিলের ওদিকের চেয়ারে বসে চোখের ইশারায় অমুকে বসতে বললেন। অমু সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। ওর বুকের ভেতর আবার ঢিবঢিব করতে শুরু করেছে। চিঠি পড়ে ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে লিখেছে এ চিঠি? তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"এইটুকু তো চিঠি, কিন্তু অর্ধেকটা সবুজ আর অর্ধেকটা কালো কালিতে লেখা কেন?"

"কালি ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই...।"

"তোমার পুরো নাম লিখেছ, কিন্তু ঝুমুরের পুরো নাম কোথায়? ঝুমুর কী—ঘোষ, বোস না মিত্তির?"

প্রশ্ন শুনে অমু লজ্জায় মাথা নিচু করল। সত্যিই তো ঝুমুররা কী ও জানে না। ডাক্তারবাবু এবার একটু মুচকি হেসে বললেন, "তবে তোমার চিঠিতে একটাও বানান ভুল নেই, পরীক্ষায় ফার্স্ট-

সেকেণ্ড কিছু হও?"

"হুই, সেকেণ্ড।"

"ফার্স্ট নয় কেন? এবার ফার্স্ট হতে পারবে?"

"পারব।"

"বেশ। বড় হয়ে কী হবে তুমি?'

অমু গত রবিবারেই ঠিক করেছিল, বড় হয়ে ও বিজ্ঞানী হবে। কিন্তু 'বিজ্ঞানী' শব্দটা ওর কিছুতেই মনে পড়ল না, তাই ও চুপ করে থাকল। এমন সময় একটা টেলিফোন এল। ডাক্তারবাবু ফোনে কী সব শুনে চটে গিয়ে বললেন, "সে কী! আমাকে এতক্ষণ জানাননি কেন?"

বলেই লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যাবার সময় ডাক্তারবাবু অমুকে কিচ্ছু বলে গেলেন না। এমন কী, ওর দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। অমু এখন কী করবে, বসে থাকবে না চলে যাবে? কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর অমুর আবার ভয় করতে লাগল। ডাক্তারবাবু যাবার সময় রেগে গেছেন, যদি আরও রেগে ফেরেন!

অমু ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, তারপর ফিরে এল মায়ের কাছে। ও ভেবেছিল, ফিরে এসে বকুনি খাবে। সবাই হয়ত ওর খোঁজ করছিল এতক্ষণ। কিন্তু কই, কেউ কিছু বলল না তো। কাছে এসে অমু দেখল মায়ের এক হাতের পাঁচ আঙুলে আর-এক হাতের পাঁচ আঙুল ঢোকানো। তার মানে মা গল্প করছে। মা গল্প করছে, আর সবাই শুনছে মন দিয়ে।

অমু জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে নিচু-বাড়ির ছাত, আরও নীচে রাস্তা। রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে, কিন্তু গাড়িগুলো এখান থেকে কী ছোট-ছোট লাগছে দেখতে।

একটু পরেই টুং-টুং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। এবার বাইরের লোকদের চলে যেতে হবে। মায়ের কাছে যেতেই মা আদর করে বলল, "কী, তুমি এত চুপচাপ কেন? মন খারাপ?"

ওর সত্যিই মন খারাপ, কিন্তু মা কী করে জেনে ফেলল! ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মা বলল, "সামনের রোববারেই আমি বাড়ি চলে যাব, তুমি আমাকে নিতে আসবে, কেমন?"

অমু বলল, "আচ্ছা।"

বাড়ি ফিরে এসে অমুর শুধু ঝুমুরের কথা মনে পড়ছিল। ঝুমুরের ঘরটা কী ছোট্ট আর বাজে। বিছানার ধারে একটা জানলা পর্যন্ত নেই। ওই ঘরে কি কেউ একা-একা থাকতে পারে? একদিন থেকেই ও কী রোগা আর কালো হয়ে গেছে। ওখানে থাকতে ওর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে, না হলে ও অমন করে কাঁদত না। হঠাৎ অমুর 'বিজ্ঞানী' শব্দটা মনে পড়ে গেল। ও মনে-মনে তিনবার বলল—বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী। বড় হয়ে ও বিজ্ঞানী হবেই হবে। তারপরে একটা কিছু আবিষ্কার করে ঝুমুরকে ও একেবারে ভাল করে দেবে।

রাত্তিরে শোবার সময় অমু হাত জোড় করে বলল, "ঠাকুর তুমি ঝুমুরকে বড় ঘরটাতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। একা-একা থাকতে ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।" পরদিন সক্কালবেলায় ও ছাতে উঠে অনেকগুলো কাক আর চড়াইকে পেট ভরে রুটির টুকরো খাওয়াল। তার পরদিন ভোরে ফুলগাছে জল দিল। তার পরদিন সকালে ও ওদের পোষা কুকুর মিংকিকে নিজের ভাগের ডিমটা খেতে দিল। ঠাকুমা বলেছে, ভাল কাজ করলে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। তিন দিনে তিনটে ভাল কাজ করে অমু মনে-মনে একটা কথাই শুধু বলছো—ঝুমুর যেন আবার আগের ঘরে ফিরে আসে।

রোববার আসতেই বাড়ির সবাই খুশি হয়ে উঠল—আজ মা আসবে। মা আসবে জেনে অমুর খুব আনন্দ হচ্ছিল, কিন্তু ঝুমুরের কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আবার। ঝুমুরকে যদি বড় ঘরে ফিরিয়ে না আনে। শুধু তাই নয়, ডাক্তারবাবু যদি ভাবে ঝুমুরই অমুকে চিঠি লেখায় কথা শিখিয়ে দিয়েছে, আর তাই ভেবে যদি ঝুমুরকে বকুনি দেয়। এইসব ভাবতে-ভাবতে বিকেল

হয়ে গেল। আর বিকেল হতেই অমু আর অমুর বাবা হাসপাতালে যাবে বলে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

হাসপাতালের লম্বা বারান্দায় পা দিতেই অমুর আবার বুকে ঢিব্‌ঢিব্‌ করতে শুরু করে দিল। সে-দিনও করেছিল, তবে আজকে আরও বেশী, অনেকক্ষণ ধরে ফুটবল খেললে যেমন হয় ঠিক সেইরকম। বড় ডাক্তারবাবুর ঘরের দরজার দুটো পাল্লাই আজ বন্ধ। হাঁটতে-হাঁটতে বাবা কী যেন বলছিল, অথচ অমু ঠিক বুঝতে পারছিল না।

মায়ের ঘরে ঢুকতেই অমু প্রথমে দেখতে পেল মাকে, তারপরেই ঝুমুরকে। মা বসে আছে, আর পাশের বিছানায় শুয়ে আছে ঝুমুর। ঝুমুর ওকে দেখতে পেয়েই হাসল। ওকে আবার পুরনো জায়গায় দেখতে পেয়ে অমুর এত আনন্দ হচ্ছিল যে, ও আর-একটু হলেই চিৎকার করে উঠত।

বাবা মায়ের টেবিলের ওপর থেকে কয়েকটা কাগজ তুলে নিয়ে মাকে বলল, "তুমি তাহলে তৈরি হয়ে নাও, আমি একেবারে ট্যাক্সি ডেকে নিয়েই ফিরব।" বাবা চলে যেতেই মা "অমু বোসো" বলে টুকিটাকি জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল।

অমু বসল না, ঝুমুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুমুর হাসছিল, ও আবার আগের মতো ফর্সা হয়ে গেছে। অমু জিজ্ঞেস করল, "কবে এলে এখানে?"

"কাল।"

"ভাল লাগছে!"

"হ্যাঁ, খুব ভাল।"

"কেউ কষ্ট পেলে আর হাসবে?"

"না।"

একটু থেমে ঝুমুর আবার বলল, "আমি সব জানি।"

"কী?"

"বড় ডাক্তারবাবু সব বলেছে আমাকে, তুমি কী ভাল!"

কেউ ভাল বললে অমুর খুব লজ্জা করে। লজ্জা পেয়ে ও মুখ নিচু

করল, তারপরেই হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়ে গেল। “আচ্ছা ঝুমুর তোমরা কী ?”

“কী মানে ?”

“এই যেমন আমরা মিত্র।”

“আমরা রায়, ঝুমুর রায়।”

অমুর ভীষণ ইচ্ছে করছিল বড় হয়ে ও কী হবে, কার জন্যে হবে— এইসব বলতে। কিন্তু বলি-বলি করেও বলা হল না। এমন সময় বাবা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে মাকে বলল, “চলো এবার, ট্যাক্সি এসে গেছে।”

মা বিছানা থেকে নেমে ঝুমুরের কাছে গেল, তারপর ওর চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বলল, “তুমি আর একটুও দুষ্টুমি করবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে, কেমন। আমরা মাঝেমধ্যে এসে তোমাকে দেখে যাব।”

ঝুমুর কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না, ওর দু-চোখ ভরে গেল জলে। কিন্তু ও কাঁদল না, জলভর্তি চোখ নিয়ে একটুখানি হাসল।

অমুরা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

———



বিকেল চারটে বাজলেই পার্কে জোর খেলা শুরু হয়ে যায়। ফুটবলের সময় ফুটবল, ক্রিকেটের সময় ক্রিকেট, এইসব খেলার মাঝেমধ্যে আবার চোর-চোর খেলাও আছে। নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে আছে অন্তু, সোনা, সমর, বিলটু, বুবু আর বাপ্পা। এই ছ'জনের সঙ্গে প্রতিদিনই আরও ছ-সাতজন জুটে যায়। বারো-তেরোজন ছেলে বিকেল চারটে থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত সারা পার্ক গমগম করে রাখে। এই নিয়মই চলছিল বছর-তিনেক ধরে, কিন্তু সেদিন পার্কের আশেপাশের বাড়ির সবাই অবাক হয়ে দেখল, পার্ক একেবারে শান্ত! এমন তো হওয়ার কথা নয়! ডানপিটে ছেলেগুলো কি পার্কে আসেনি!

কৌতূহলী হয়ে এ-বাড়ি সে-বাড়ির কয়েকজন উঁকি মারল পার্কে। তারপর আবার অবাক হল। দুরন্ত ছেলেগুলোর সব ক'টাই আছে পার্কে, কিন্তু ওদিকের ওই বেঞ্চিটায় ঠাসাঠাসি কার বসে করছে কী? ছেলেগুলোর মধ্যিখানে আধ-বুড়ো একটা লোক। লোকটার মাথায় মস্ত টাক। হাত নেড়ে মুখ নেড়ে লোকটা কী যেন বলছে, আর চোখ গোল-গোল করে শুনছে সব ক'টা ছেলে।

সবাই আন্দাজে বুঝল, লোকটা গল্প বলছে আর ছেলেগুলো শুনছে। লোকটাকে কেউ-ই কিন্তু চিনতে পারল না। বেপাড়ার যারা এ-পার্কে বেড়াতে আসে মিয়মিত, তাদেরও কেউ নয় লোকটা।

এমনও হতে পারে, লোকটা চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে সবে। ওদিকের ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচের বেঞ্চে রিটায়ার্ড-করা লোকেদের একটা দল বসে। ওদের সঙ্গে এই লোকটার এখনও বোধহয় বন্ধুত্ব হয়নি, হলেই নির্ঘাৎ চলে যাবে ওদের দলে।

পরদিনও একই দৃশ্য দেখা গেল। লোকটা গল্প বলছে, আর ছেলেরা শুনছে হাঁ করে। অভিভাবকদের কেউ-কেউ বলল, একটা ভাল লক্ষণ, শান্ত হয়ে বসে গল্প শুনতে-শুনতে ওরা হয়ত সত্যিই কিছুটা শান্ত হয়ে যাবে।

তার পরদিনও একই দৃশ্য, তার পরের দিনও তাই। দেখতে-দেখতে দিন-পনেরো কেটে গেল। দস্যি ছেলেগুলো এখন আর ফুটবল-ক্রিকেটের নামও করে না, কিন্তু বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই দৌড়য় পার্কে। দৌড়ে গিয়ে ওই বেঞ্চিটায় ঠাসাঠাসি করে বসে। ওদের মধ্যিখানে টাক-মাথা ওই লোকটা। লোকটা একই ভঙ্গিতে গল্প বলে, আর ওরা একইভাবে হাঁ করে গল্প শোনে।

লোকটা কী গল্প বলে, তাই নিয়ে ছেলেগুলোর বাড়ির লোকেরা অ্যাদ্দিন মাথা ঘামায়নি একদম। কিন্তু এখন রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। অসম্ভব দস্যি ছেলেগুলো ভয় বলে কিছু জানত না, কিন্তু এখন এক নম্বরের ভীতু হয়ে গেছে। সন্ধে হলেই ছুটে ঘরের মধ্যে চলে আসে। একা-একা বাথরুম তো দূরের কথা, বারান্দাতেই যেতে চায় না। রাত্তিরে হঠাৎ আলো নিবে গেলে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে। ওদের ভয় বাড়তে-বাড়তে এখন এত বেড়ে গেছে যে, কেউ আর একা ঘরে থাকতে চায় না। রাত্তিরে ঘুমের মধ্যেও কেউ-কেউ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। বাড়ির লোকেরা সকালে ছেলেদের বিছানা তোলার সময় বালিসের তলায় অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস পায়। যেমন, তুলসীপাতা, সর্ষের দানা, লোহার চাবি। ভয় পেয়ে পেয়ে ডানপিটেদের স্বাস্থ্যও বেশ খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন এত ভয়? তাও আবার দু'একজনের নয়, দস্যি ছেলেদের সবাই ভীতু হয়ে গেছে একসঙ্গে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল আসল কারণ।

পার্কের ওই টাক-মাথা লোকটা রোজ ওদের একটা করে ভয়ংকর ভূতের গল্প বলে। ভূতে এত ভয়, কিন্তু ভূতের গল্প শোনাও চাই রোজ-রোজ। রোজ চারটে বাজতে না বাজতেই সবাই গল্প শোনার জন্যে দৌড়য় পার্কে। যখন ওরা খেলাধুলো করত তখন ওদের বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে যেত প্রায়। এখন সূর্য ডোবার আগেই বাড়ি চলে আসে সবাই। কারণ, সন্ধে হওয়া মাত্তরই নাকি ভূতরা গাছ থেকে নেমে পড়ে। তারপর পছন্দসই ঘাড় খুঁজে বেড়ায় চাপবার জন্যে।

বাড়ির লোকেরা ওদের কত করে বুঝিয়েছে, সত্যি-সত্যি ভূত বলে কিছু নেই। ভূতের গল্প নেহাতই গল্প। কিন্তু এ-সব কথায় ছেলেরের কেউ-ই কান দেয়নি। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভূত আছে। রাত্তির হলেই ভূতরা প্রত্যেক মানুষের পেছনে ঘুরে বেড়ায় ধরবার জন্যে। ওদের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল তুলসিপাতা, সর্ষের দানা কিংবা লোহা কাছে রেখে দেওয়া। ভূতরা এই জিনিসগুলো ভয় পায়, কাছে থাকলে আসে না। বাড়ির লোকেরা বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ওদের ধারণা, একটুও পালটায়নি। ভূত বিশ্বাস করার জন্যে ওদের মধ্যে কেউ-কেউ মারধোরও খেয়েছে বাড়িতে, তবে তাতেও কোনো কাজ হয়নি!

বাবা-মা'রা ওদের প্রত্যেককে বলে দিয়েছে, পার্কে গিয়ে তোমরা আবার আগের মতো খেলাধূলো করবে, কক্ষনো ভূতের গল্প শুনতে যাবে না। কিন্তু একই কথা বারবার বলেও কোনো কাজ হয়নি। পার্ক এখন এক্কেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে। ছেলের দল ওই টাক-মাথা লোকটাকে ঘিরে বসে চোখ গোল-গোল করে ভূতের গল্প শোনে, আর সন্ধে হতে না হতেই ফ্যাকাশে মুখে ফিরে আসে বাড়িতে। ভয় পেয়ে পেয়ে কারও-কারও স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে গেছে বেশ।

এইভাবে আরও কিছুদিন চললে ছেলেগুলো অসুখে পড়ে যাবে নির্ঘাত। ওদের বাবা-মা'রা এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা

করেছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। কেউ-কেউ বলেছে, আর কয়েকটা দিন দেখা যাক, ওই টাক-মাথা লোকটা রিটায়ার-করা বুড়োদের দলে চলে যাবে হয়ত। কিন্তু বেশি দিন অপেক্ষা করার মানেই হল, ছেলেগুলোকে আরও বেশি করে ভীতু করে তোলা। তাছাড়া টেকো লোকটা শেষ পর্যন্ত বুড়োদের দলে নাও যেতে পারে। অন্তুর বাবা সেদিন একটু রেগে গিয়েই বলল, "অত ভাববার কী আছে। লোকটাকে গিয়ে বললেই তো হয়, আপনি ওদের ভূতের গল্প বলবেন না। ওরা ভীষণ ভীতু হয়ে যাচ্ছে।"

অন্তুর বাবার কথা এক কথায় মেনে নিল সবাই। কিন্তু, কথাটা কে বলবে ওকে? এ বলল তুমি বলো, ও বলল তুমি বলো। অনেকটা সেই বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো। ঘণ্টা বাঁধার জন্যে কাউকেই পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত।

সোনার বাবা বলল, ভদ্রলোককে আমি বলতে পারতাম কথাটা। কিন্তু মুশকিল হল, উনি যদি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, আমি বাচ্চাদের ভালবাসি তাই গল্প বলি। সেটা যদি আপনাদের পছন্দ না হয় ওদের বারণ করে দেবেন আমার কাছে আসতে।"

কথাটা ঠিক। ভদ্রলোককে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। তাহলে এখন উপায়?

যে-কোনো কঠিন কাজে উপায় বার করতে এক নম্বরের ওস্তাদ টাবলু। বাচ্চাদের খুব প্রিয় টাবলুদা। বাবা-মা'রা টাবলুকে ডেকে পাঠাল। টাবলু এসে সব শুনেটুনে বলল, "কুছ পরোয়া নেই। আমি কালকেই ব্যবস্থা নিচ্ছি, পরশু থেকে ওই ভদ্রলোককে আপনারা আর পার্কে দেখতে পাবেন না।"

সমরের মা বলল, "তুমি কিন্তু আবার ভদ্রলোককে অপমান করে বোসো না টাবলু।"

টাবলু হেসে বলল, "না-না, ও-সব কিছু করব না।"

পরশু দিন সত্যিই ভদ্রলোককে আর পার্কে দেখা গেল না। তার পরদিনও না। কখনোই না। ছেলের দল কয়েকদির শুকনো মুখ

ওই বেঞ্চিটার চারপাশে ঘুরঘুর করল। তারপর আবার মেতে উঠল ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে। খেলাধুলো পুরো দমে কয়েকদিন চলার পরে ওদের ভয় ভেঙে গেল অনেকখানি। ওরা আস্তে-আস্তে আগের মতো হয়ে উঠল আবার। কিন্তু টাবলু ভদ্রলোককে তাড়াল কী করে?

ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে টাবলুও উধাও। শোনা গেল টাবলু বেড়াতে গেছে জব্বলপুরে। পনেরো দিন পরে ফিরে এলে বাবা-মা'রা ঘিরে ধরল টাবলুকে। সবারই এক প্রশ্ন: কী করে লোকটাকে তাড়ালে টাবলু?

টাবলু রহস্য করার ভঙ্গিতে বলল, "আমি দেখেছি, যারা খুব ভুতের গল্প করে, তারা খুব ভূতে বিশ্বাস করে। সুতরাং ঠিক করলাম, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব।"

"কী রকম?"

"ঠিক করলাম, ভূত দিয়েই ভূতের গল্প বলিয়েকে তাড়াতে হবে! তাই করলাম। কাজও হল সঙ্গে সঙ্গে। আমি ভদ্রলোককে তাড়াবার জন্য একটা ভূত পাঠিয়েছিলাম।"

টাবলুর কথার মাথামুণ্ডু কেউই বুঝতে পারছিল না। বাপ্পার মা অধৈর্য হয়ে বলল, "ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলো তো টাবলু।"

টাবলু বলল, "ভদ্রলোক তো সন্ধের পরেও পার্কে একা-একা বসে থাকতেন কিছুক্ষণ। তা সেদিন অন্ধকার নামতেই ওর পাশে গিয়ে বসল খুব রোগা, লম্বামতো একটা লোক। লোকটা বসেই হাওয়া থেকে চারটে মাছভাজা তুলে নিয়ে কচমচ করে খেল। তাই না দেখে ভদ্রলোকের আক্কেল গুড়ুম। রীতিমত ভয় পেয়ে রোগা লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। একটু পরে ভদ্রলোক পরিষ্কার শুনতে পেলেন, কে যেন নাকি সুরে বলছে, তুই কেন রোজ আমাদের নামে মিথ্যে-মিথ্যে গল্প বলিস। দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি। ভদ্রলোক ঠক-ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে দেখেন, পাশের রোগা লোকটা মুখ বন্ধ করে বসে আছে! তাহলে কথাগুলো বলছে কে? ব্যস, ভদ্রলোক ভূতের ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল পার্ক থেকে!"

বিলটুর মা বলল, "এটা কী করে হল টাবলু ?"

টাবলু একটু হেসে নিয়ে বলল, "ভদ্রলোককে তাড়াবার জন্য যাকে পাঠিয়েছিলাম, তিনি একজন ভেনট্রিলোকুইস্ট।"

"সেটা আবার কী ?" আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বিলটুর মা।

"ভেনট্রিলোকিউশন হচ্ছে মুখ বন্ধ করে কথা বলার কায়দা। মনে হবে, অন্য কেউ কথা বলছে। ভদ্রলোকেরও তাই মনে হয়েছিল। ভেবেছিলেন, সত্যি-সত্যি ভূতে কথা বলছে। ব্যস, ভূতের কথা শোনার পরে কেউ আর ওখানে বসে থাকে !"

"কিন্তু ওই যে হাওয়া থেকে মাছ-ভাজা ধরে খাওয়ার পরে নাকি স্বরে ভূতের কথা—দারুণ গা-ছমছমে ব্যাপার না ?"

"দারুণ," বুবুর মা বলল, "তবে ওই ভদ্রলোকের জায়গায় আমি থাকলে ঠিক অজ্ঞান হয়ে যেতাম !"

বুবুর মা'র কথা শুনে হেসে উঠল সবাই। তারপর ঠিক হল, সামনের শনিবার সন্ধেয় টাবলু ভেনট্রিলোকুইস্ট ওই ভদ্রলোককে ক্লাবে নিয়ে আসবে। ভদ্রলোক ভুতুড়ে কথার খেলা দেখাবেন। তারপর সত্যি-সত্যি খাওয়া হবে মাছ-ভাজা আর কফি !

—



কাপুটিঁ মানে সিঁড়ি

ইন্দ্র আর দূর্বা তুই ভাইবোন। ইন্দ্রর বয়েস ছয়, দূর্বার তিন। তু'জনের খুব ভাব। ঝগড়াঝাটি হলে আড়ি হয়। কিন্তু আড়ি হওয়ার একটু পরেই আবার ভাব হয়ে যায়। দূর্বা দাদার খুব ভক্ত। দাদা যা করে, ও-ও তাই করে।

শুধু একটা জিনিসই দূর্বা দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে করতে পারে না। সেটা হল দাদার মতো স্কুলে যাওয়া। কেননা দূর্বা এখনও স্কুলেই ভর্তি হয়নি। তবে দাদার সঙ্গেই ও চান করে, দাদার সঙ্গেই খায়, দাদার সঙ্গেই মায়ের কাছে পড়তে বসে।

দাদার মতোই ও বই নিয়ে গড়গড় করে পড়ে। দাদার মতোই মাকে জিজ্ঞেস করে—এটার মানে কী, সেটার মানে কী। মা মানে বলে দিলে ও দাদার মতোই মন দিয়ে শোনে, তারপর আবার পড়তে শুরু করে।

ওর পড়া দেখে দাদা হেসে ফেলে হা-হা করে, মা হাসেন মুখ ফিরিয়ে। দাদার হাসির শব্দ শুনে দূর্বা তাকায়, তারপর কী ভেবে নিজেও একটু হাসে। মা বলেন, "কই পড়ো।"

দূর্বা আবার পড়তে শুরু করে। পড়া শুনে ইন্দ্র আবার হাসতে গেলে মা মুখের ওপর আঙুল চেপে বারণ করেন ওকে?

কেন এত হাসি বলো তো?

আসলে দূর্বা পড়তেই শেখেনি এখনও। কোন্‌টাকে 'অ' বলে, কোন্‌টাকে 'আ' বলে, কোন্‌টাকে 'এ' বলে, কোন্‌টাকে 'বি' বলে—কিছুই জানে না। বইয়ের সোজা-উলটোও জানে না। উলটো করে বই ধরে গম্ভীরভাবে আবোল-তাবোল পড়ে গেলে হাসি পাবে না? ইন্দ্র তাই হাসে, মাও হাসেন! তবে ইন্দ্র খুব জোরে হাসলে মা ওকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলেন, "কক্ষনো হাসবে না। হাসলেই ও রেগে যাবে। রেগে গেলে বিরক্ত করে মারবে আমাদের।"

দূর্বার পড়াটা এইরকম: সেণ্টর বলল, আমি যাব। তারপর জলে পড়ে গেল ধুপুস। তারপর ঘুম থেকে উঠল। কাপুটি ঘুরতে-ঘুরতে-ঘুরতে। তারপর বাঘ হালুম। টাপি খেল জলের। তারপর মিনিবাস-মিনিবাস।

ইন্দ্র পড়তে-পড়তে মানে জিজ্ঞেস করে মাকে। যেমন, সুইপ মানে কী? রেডিয়াণ্ট মানে কী? কেজ মানে কী? স্টেয়ারকেস মানে কী?

মা শব্দের মানেগুলো বলে দেন ইন্দ্রকে।

তাই না শুনে দূর্বাও ঠিক দাদার মতো করে মাকে জিজ্ঞেস করে—মা কাপুটি মানে কী গো? টাপি কী?

শুনে হা-হা করে হেসে ওঠে ইন্দ্র। কাপুটি আর টাপি তো ওর নিজেরই কথা, তার আবার মানে! মা ইন্দ্রকে একটু বকে দিয়ে বলেন, "হাসছ কেন? তুমি মানে বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতে পারো, আর ও পারে না। ও খুব লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি কিসের মানে জিজ্ঞেস করলে দূর্বা? কাপুটি? কাপুটি হচ্ছে—সিঁড়ি। আর টাপি? টাপি হচ্ছে, টাপি—হচ্ছে—খাঁচা।"

উত্তর শুনে দূর্বা খুব খুশি হয়ে আবার পড়তে শুরু করল, "সেণ্টর বলল, আমি যাব। তারপর কাপুটি পড়ে গেল। তারপর টাপি মিনিবাস, প্লেন—ভোঁ-ও-ও-ও। কাপুটি মানে সিঁড়ি, টাপি মানে খাঁচা।"

তা, এইভাবেই পড়াশুনো চলতে লাগল রোজ সকাল আর সন্ধেয়।

কয়েকদিন পরে ইন্দ্রদের স্কুলে ফার্স্ট টার্মের পরীক্ষা। ইন্দ্র আগে কখনও পরীক্ষা দেয়নি। তাই পরীক্ষা নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু মায়ের কাছে শুনে শুনে ওর মনে হল, পরীক্ষাটা খুব ভয়ের ব্যাপার। কিন্তু পরীক্ষা দিতে গিয়ে ওর একটুও ভয় করল না।

পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল ইন্দ্র সেকেণ্ড হয়েছে। যে ফার্স্ট হয়েছে, সে ইন্দ্রের চাইতে মোটে চার নম্বর বেশি পেয়েছে। চার নম্বর বেশি ইংরেজিতে। মা বললেন, "ইশ্‌! ইংরেজিতে আর চারটে নম্বর পেলে না! সবই তো তোমার জানা প্রশ্ন ছিল।"

ইন্দ্র শুকনো মুখে বলল, "আমি সবই তো ঠিক লিখেছিলাম মা।"

দিন-সাতেক পরে স্কুলের আন্টি ইন্দ্রর পরীক্ষার খাতাগুলো বাড়িতে দেখাবার জন্যে ইন্দ্রর হাতে দিয়ে দিলেন। ইন্দ্র খাতাগুলো ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। বাড়ি ফিরে তুলে দিল মায়ের হাতে।

মা এক-এক করে সব খাতা দেখার পরে ইংরেজি খাতাটা নিলেন। তারপর খাতার পাতা উলটেই চমকে উঠে বললেন, "এমা! এ কী লিখেছ তুমি!"

ইন্দ্র মায়ের ঘাড়ের পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, খাতায় লাল কালির দুটো গোল দাগ। দাগদুটো ও দেয়নি। কে দিয়েছে? আন্টি?

মা বললেন, "ইশ! কী লিখেছ তুমি? স্টেয়ারকেসের মানে কাপুটি! কেজ-এর মানে টাপি।"

মা ধরিয়ে দিতেই ইন্দ্র ধরতে পারল গোলমালটা।

কিন্তু ও বেচারার কী দোষ?

দূর্বা যদি রোজ-রোজ কানের কাছে চেঁচায়—কাপুটি মানে সিঁড়ি, টাপি মানে—খাঁচা—ভুল হবে না?

ভীষণ রেগে গিয়ে ইন্দ্র বলল, "মা, তুমি আর দূর্বাকে আমার পাশে বসে আবোল-তাবোল পড়তে দেবে না তো। ওইসব শুনলে

আমার পরীক্ষায় ভুল হয়ে যাবে আবার।”

মা ইন্দ্রকে শান্ত করে বললেন, “তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো না। দূর্বাকে সত্যি-সত্যি পড়া শিখিয়ে দাও। দূর্বা যদি সত্যি-সত্যি পড়ে, তাহলে ওরকম ভুল তোমার আর হবে না।”

কিন্তু, দূর্বাকে সত্যি-সত্যি লেখাপড়া শেখানো সত্যিই খুব কঠিন। তবে হাল ছাড়ল না ইন্দ্র। চেষ্টা করতে করতে সব অক্ষর চিনিয়ে দিল দূর্বাকে। দূর্বা এখন ওর পাশে বসে ঠিক-ঠিক পড়ে।

সেকেণ্ড টার্মের পরীক্ষায় ইন্দ্র ওরকম ভুল আর করেনি। সব প্রশ্নের উত্তর নাকি সঠিক লিখেছে। ফার্স্ট হতে পারবে কী না কেউ জিজ্ঞেস করলে ইন্দ্র বড়দের মতো মুখ করে বলে ‘দেখি’। ধারে কাছে দূর্বা থাকলে কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠে—“দেখি না, দাদা ফার্স্ট হবেই হবে।”



হনুমানের লেজ ধরে

টোটোর সেদিন কী আনন্দ! ওর নামে চিঠি এসেছে। ওর নামে চিঠি এর আগে কখনো আসেনি। লেটার বক্স থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে টোটো "আমার চিঠি" বলে সারা বাড়ি ঘুরে এল তিনবার। মা বলল, "কার চিঠি, ? কে লিখেছে ? দেখি ?"

খামের ওপরে ওর নাম দেখে টোটো এতই খুশি যে, খামটা খোলার কথা ও ভুলেই গিয়েছিল। মা'র কথায় খেয়াল হল। মা হাত বাড়িয়েই ছিল, কিন্তু মাকে না দিয়ে ও নিজেই খুলে ফেলল খামটা। চিঠি লিখেছে টিপু। টিপু লিখেছে—

প্রিয় টোটো, আমরা বক্সারে এসেছি। বক্সার জায়গাটা খুব ভাল। এখানে হুমায়ুন আর শের শাহের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে একটা বিরাট বাগান আছে। বাগানে অনেক গাছের ওপর অনেক হনুমান থাকে। আমি একটা কুকুর পুষেছি। তার নাম জিমি। জিমি দু'পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। তোরা শিগগির এখানে বেড়াতে চলে আয়। তাহ'লে খুব মজা হবে। —ইতি টিপু

বানান করে চিঠিটা পড়ল টোটো। তারপর মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, হুমায়ুন কী ?"

মা বলল, "কী না, কে ?"

তারপর মা বোঝাতে শুরু করল—কে হুমায়ুন, কে শের শাহ, কী হয়েছিল যুদ্ধের ফলাফল। কিন্তু ওদিকে টোটোর একটুও কান ছিল না। ওর মাথায় ঘুরছিল শুধুমাত্র হনুমানগুলোর কথা। ও গত বছর চিড়িয়াখানায় হনুমান দেখেছে। সেই হনুমান সব সময়

চোখের সামনে দেখা! ওহ্, ভাবলেই গা শিরশির করে ওঠে।

হুমায়ুন-শের শাহের যুদ্ধের গল্প কদ্দুর এগিয়েছে কে জানে, টোটো হঠাৎ মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "মা, বক্সারে যাব, বক্সারে যাব।"

মা বলল, "বাবাকে বলো।"

বাবা বলল, "আরে, আমি তো বেড়াতে যাওয়ার কথাই ভাবছিলাম। তা, টিপুর বাবা যখন বক্সারে বদলি হয়েছেন, চলো, ওখানেই যাওয়া যাক।"

পরের রোববার টোটো আর ওর বাবা, মা বক্সারে যাওয়ার জন্যে ট্রেনে উঠে পড়ল। ট্রেনে ঘুমোতে-ঘুমোতে টোটো হনুমানের স্বপ্ন দেখল। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে ও। চারদিকে অনেক হনুমান। কারও হাতে চকোলেট, কারও হাতে আইসক্রীম, কারও হাতে ফুটবল। সবাই বলছে—টোটো, এগুলো তোমার জন্যে এনেছি।

এত সুন্দর স্বপ্নটা দেখবার পরেই টোটোর ঘুম ভেঙে গেল। তখন সবে সকাল হয়েছে, কিন্তু ও বিছানা ছেড়ে উঠল না। পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করল আবার, তবে স্বপ্নটা আর দেখতে পেল না।

একটু পরে মা ডাকল, "টোটো-টোটো, উঠে পড়ো এবার, আর একটু পরেই বক্সার এসে যাবে।"

বক্সারের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল টোটো।

মা বলল, "যাও, বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসো।"

ট্রেন ছুটে চলেছে ঝিক-ঝিক ঝিক-ঝিক করে। জানলার বাইরে মাঠ, ক্ষেত, দূরে ছোট-ছোট পাহাড়। লম্বা লেজওয়ালা পাখি দোল খাচ্ছে ইলেকট্রিকের তারে বসে। কী সুন্দর দেখতে সব কিছু! জানলার শিকে গাল লাগিয়ে বসে কিছুক্ষণ দেখার পরে হাতমুখ ধুতে চলে গেল টোটো।

ফিরে এল যখন, তখন বাবার বেডিং বাঁধা হয়ে গেছে। টোটো

জামাকাপড় পালটে নিল। তারপর টোস্ট আর ডিম খেতে-খেতে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকল বাইরের দিকে। সকালের ঝাপসা রোদ আস্তে-আস্তে ঝকঝকে হয়ে উঠেছিল। একইরকমের মাঠ, একইরকমের ক্ষেত, দূরের ছোট-ছোট পাহাড়গুলোও ঠিক একইরকম দেখতে ; কিন্তু দেখে-দেখে আর আশ মিটছিল না টোটোর।

হঠাৎ ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল, তারপরেই গতি কমে গেল ট্রেনের। বাবা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কী যেন দেখে নিয়ে বললেন, "বক্সার এসে গেছে, নামতে হতে এবার।"

লাফিয়ে উঠল টোটো। মা'র হাত-ব্যাগটা টেনে নিল। একটু পরেই ঝীইইক, ঝীইইক করতে-করতে ট্রেনটা এসে দাঁড়াল বক্সার স্টেশনে।

টিপু আর ওর বাবা, মা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। ওদের দেখে সে কি হৈ-চৈ। হৈ-চৈ একটু কমে গেলে টোটো টিপুকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "এই, কোথায় রে?"

"কী কোথায়?"

"হনুমান।"

শুনে টিপু ঠিক বড়দের মতো হেসে বলল, "স্টেশনে কি হনুমান থাকে, চল্ না বাড়িতে, দেখবি সব লাইন দিয়ে তোর জন্য বসে আছে।"

নতুন জায়গায় বেড়াতে এলে সবাই চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে, কিন্তু টোটোর কিছু দেখতে ইচ্ছে করছিল না। স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে ও টিপুদের বাড়িতে এল শুধুমাত্র হনুমানের কথা ভেবে-ভেবে।

টিপুদের বাড়িটা বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। গেটের সামনে খুব লম্বা ছ'টা গাছ, সবকটা গাছের গায়ে কে যেন সাদা রঙ লাগিয়ে দিয়েছে। টোটো বলল, "বাবা, গাছগুলো রঙ করেছে কেন?"

ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে। টিপুর বাবা হাসি থামিয়ে বলল, "কেউ রঙ করেনি গাছে, ওই গাছগুলোর গায়ের রঙই ওইরকম। সাহেব-গাছ বলতে পারো। ওর নাম 'ইউক্যালিপ্‌টাস'।

এই গাছ থেকে গন্ধ তেল হয়। আর একটা কাজও হয়, আমরা সেটা করে থাকি প্রায়ই। আমাদের এখানে বেশ মশা আছে। মশা তাড়াবার জন্যে আমরা ইউক্যালিপ্‌টাসের শুকনো পাতা জ্বেলে দিই ঘরের মধ্যে। ওই ধোঁয়ায় মশাগুলো পাঁই-পাঁই করে পালিয়ে যায় বাগানে।”

ঠিক গেটের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। সামনে ছোট্ট লন, লনের সামনে বিরাট একতলা বাড়ি। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে টোটো ফিসফিস করে টিপুকে বলল, “এই তোদের বাগান?”

“এটা তো লন, বাগান বাড়ির পেছন দিকে।”

“চল্ বাগানে যাই!”

“এক্ষুনি কি রে! খাবারটাবার খেয়ে নে। মা তোদের জন্যে কত কিছু বানিয়েছে।” টিপুর কথা শুনলেই বোঝা যায় যে, ‘কতকিছু’ শুধু খাওয়াবার জন্যেই নয়, খাওয়ার জন্যেও ও ছটফট করছে। টোটোরও বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল, সেই কখন একটা টোস্ট আর ডিম খেয়েছে। কিন্তু এখন খাওয়ার কথা শুনে ও কেমন যেন চটে গিয়ে বলল, “না না, এখন খাব না, চল্ আগে বাগান থেকে ঘুরে আসি।”

“কেন, বাগানে গিয়ে কী দেখবি?”

“বারে! তুই তো লিখেছিলি?”

“কী লিখেছিলাম?”

“লিখেছিলি না বাগানে অনেক হনুমান আছে।”

টোটোর কথায় টিপু হা-হা করে হেসে উঠে বলল, “তা হনুমান দেখার জন্যে বাগানে যাওয়ার কী দরকার, ওই দেখ না হনুমান।”

টিপুর আঙুল বরাবর তাকিয়ে টোটো দেখে, পাঁচিলের মাথায় তিনটে হনুমান বসে আছে পাশাপাশি। কী তাগড়া চেহারা, লম্বা-লম্বা লেজগুলো ঝুলে আছে মাটির একটু ওপরে। আর একবার তাকাতেই টোটো দেখে তিনটি হনুমানই চেয়ে আছে ওর দিকে। কী রাগী-রাগী চোখ, দেখলেই বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করে। হনুমানগুলো

অনেক দূরে, কিন্তু টোটো। আস্তে-আস্তে টিপুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এদের সঙ্গে স্বপ্নের সেই হনুমানগুলোর একটুও মিল নেই। স্বপ্নের হনুমানগুলো কী ভাল, কত কিছু খেতে দিয়েছিল ওকে।

বাড়ির কাজের লোকেরা মালপত্তর নামিয়ে নিল গাড়ি থেকে। তারপর টোটোরা সবাই মিলে গিয়ে ঢুকল টিপুদের বসার ঘরে। বসার ঘরে সবাই বসল, বসল না শুধু টোটো আর টিপু। চোখে চোখে ওদের মধ্যে কী যেন একটা কথা হল, তারপর ওরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাড়ির ভেতরদিকে বাগান। বাগানে অনেক গাছ। নানা ধরনের। কিন্তু গাছ দেখার জন্যে টোটো বাগানে আসেনি। যারা গাছে থাকে, এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে চলে, তাদের জন্যে এসেছে ও। কিন্তু তারা কোথায়? সারা বাগান অসম্ভব থমথমে। একটা পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা ঝাঁকড়া গাছের পাতার ফাঁকে তিন-চারটে ছোট-ছোট চোখ দেখতে পেল টোটো। চোখগুলো পিটপিট করে দেখছিল ওকে। ওই চোখগুলোর ওপর চোখ পড়তেই পা কেঁপে উঠল টোটোর।

"ওগুলো কিসের চোখ রে?"

"কোনগুলো?"

"ওই যে গাছের ফাঁকে।"

গাছের ফাঁকে চোখগুলো দেখে মুচকি হাসল টিপু। তারপর টোটোর হাতে টান দিয়ে বলল, "আয় দেখবি আয়।"

কাছাকাছি যেতেই গাছটার ডালপালা দুলে উঠল বেশ জোরে। হঠাৎ গাছের ডালপালা দুলে উঠলে কার না ভয় লাগে? টোটোরও ভয় করছিল। কিন্তু গাছের নীচে গিয়ে ও অবাক হয়ে গেল। শুধু অবাক না, দারুণ খুশি। চারটে এইটুকু-টুকু হনুমানের বাচ্চা মগডালে উঠে গাছের ডালপালা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে টোটোদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। আসলে কিন্তু ওরাই ভয় পেয়েছে। ওদের চোখ দেখলেই বোঝা যায়।

টোটো আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। হাততালি শুনে হনুমানের বাচ্চাগুলো চোখ পিটপিট করে দেখল টোটোকে। এত বাচ্চা হনুমান টোটো আগে কখনো দেখেনি। হনুমানগুলো পুচকে হলে কী হবে, ওদের লেজগুলো ইয়া বড়-বড়। ওদের শরীরের দ্বিগুণ! লেজের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে টোটো টিপুকে জিজ্ঞেস করল, "এই ওদের মা-বাবারা কোথায় রে?"

"মা-বাবা, বড়রা সবাই চাকরি করতে গেছে।"

"চাকরি!"

"চাকরি নয় তো কি। চাকরি করে কী জন্যে? খাওয়ার জন্যে তো। ওরা সবাই খাবার আনতে গেছে।"

"কোথায়?"

কেউ-কেউ গেছে ক্ষেতে। আলু, মূলো, বেগুন আনতে। আর কেউ-কেউ গেছে লোকো-শেডে।"

"লোকো-শেডে কেন? ওরা কি রেল কোম্পানিতে কাজ করে?"

"অনেকটা সেই রকমই। এখন তো এখান থেকে অনেক আখের গাড়ি চালান যায়। ওরা সেইসব গাড়িতে উঠে আখ নিয়ে আসে।"

"কখন ফিরবে ওরা?"

"বিকেল হলে।"

বিকেল হতে অনেক দেরি। টোটো তাই নির্ভয়ে টিপুর সঙ্গে সারা বাগান ঘুরল অনেকক্ষণ ধরে।

টোটো আর টিপুর মধ্যে খুব ভাব। ওরা একবার বল খেলছে, একবার ক্রিকেট খেলছে, একবার খেলছে ব্যাডমিন্টন। কিন্তু কথায় আছে না, যত হাসি তত কান্না। সেই রকম, যত ভাব তত ঝগড়া। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ব্যাডমিন্টনের ভাল র‍্যাকেটটা নিয়ে টোটো আর টিপুর মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল। ঝগড়া হতেই টোটো ওর ডান হাতের কড়ে আঙুলটা টিপুর বাঁহাতের কড়ে আঙুলে ঠেকিয়ে বলল—

আড়ি আড়ি আড়ি আড়ি, কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর, হনুমানের লেজ ধরে টানাটানি কর

টিপু এরকম ছড়া এর আগে আর কখনো শোনেনি। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "একদম শেষে কী বললি রে।"

টোটো রাগ-রাগ মুখ করে শেষ লাইনটা আবার বলল, "হনুমানের লেজ ধরে টানাটানি কর।"

যেই না বলা অমনি টিপু এক ছুটে বাগানে গিয়ে একটা বাচ্চা হনুমানের লেজ ধরে মারল এক টান। টান মারতেই হনুমানটা কিচ-কিচ, হুপাহুপ করে একটা লম্বা গাছের মাথায় উঠে বসল।

তাই না দেখে টোটো রাগের কথা একদম ভুলে গিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর হাসতে-হাসতেই বলল, "এই টিপু, তুই ওর লেজ ধরে টান মারলি কেন?"

টোটোর হাসি দেখে টিপুরও রাগ জল হয়ে গেছে। ও বলল, "বারে তুই-ই তো বললি, হনুমানের লেজ ধরে টানাটানি কর।"

"আমি কি আর সত্যি-সত্যি বলেছি। আমাদের পাড়ায় ঝগড়া হলে সবাই এই ছড়াটা বলে। এটা তো ঝগড়ার ছড়া। মিতুদিদির কাছ থেকে শিখেছি আমরা।"

শুনে টিপু বলল, "তা আমি কী করে জানব যে, এটা মিছিমিছি ছড়া। আমাদের এখানে ঝগড়া হলে কেউ ওইরকম ছড়া বলে না। ছড়াটা কিন্তু মজার, তুই আমাকে পুরোটা শিখিয়ে দে তো।"

টোটো টিপুকে ছড়াটা ভালো করে শিখিয়ে দিল।

ব্যস, তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেল ওদের নতুন খেলা।

ঝগড়া হলেই একজন ছড়াটা বলে, অমনি আর একজন গিয়ে বাচ্চা একটা হনুমানের লেজ ধরে টান মারে।

অনেক সময় হনুমানের লেজ ধরে টানার জন্যেই ওরা মিথ্যে করেই ঝগড়া বাধায়। প্রথমে ঝগড়া, তারপর ছড়া, তারপরেই হনুমানের লেজ ধরে টান মারা।

প্রথম-প্রথম হনুমানের লেজ ধরে টান মারতে টোটোর খুব ভয় করত। হোক না বাচ্চা, তাহ'লেও হনুমান তো। এখন ওর ভয় কেটে গেছে একদম। ভয় কেটে যাওয়ার একটা বড় কারণ হল

যে, ছুপুর বেলায় বড় হনুমানদের কেউ থাকে না বাগানে। বড়দের সবাই চলে যায় চাকরি করতে।

হনুমানের লেজ ধরে টানাটানি করার পাঁচ-সাতদিন পরে একদিন ছুপুরবেলায় বাড়ির ভেতর দিকের বারান্দার বসে গল্প করছিল টোটো আর টিপু। এমন সময় পেছন দিক দিয়ে আট-দশটা বাচ্চা হনুমান এসে আচ্ছা করে ওদের কান মলে দিয়ে দে দৌড় বাগানে।

হঠাৎ এতগুলো কানমলা খেয়ে ভীষণ রাগ হয়ে গেল টোটো আর টিপুর। কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পর ওরাও ছুটতে লাগল বাচ্চা হনুমানগুলোর পেছন-পেছন। ধরতে পারলে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দেবে। কিন্তু হনুমানের বাচ্চাগুলো যা দৌড়োয় না! শুধু কি দৌড়, সঙ্গে আছে বিরাট-বিরাট লাফ। দৌড়ে, লাফিয়ে ওরা বাগানের বড়-বড় গাছগুলোয় উঠে বসল। তারপর ছুলে-ছুলে সে কি হাসি ওদের।

বেচারা টোটো আর টিপু। রাগে, লজ্জায়, ছুঃখে ওদের কানগুলো আরও গরম হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু করার নেই ওদের। অত উঁচু গাছে উঠে তো আর হনুমানের বাচ্চাদের ধরা যাবে না।

ঠিক আছে ইঁট মারব। আমাদের হাতে যা টিপ না, কতদূর থেকে উইকেট ভেঙে নিই। আমাদের কান-মলা! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। রাগে গজগজ করতে করতে ইঁট খুঁজতে শুরু করে দিল টোটো আর টিপু।

মাথা নিচু করে ইঁট খুঁজছিল ওরা, তাই আগে থেকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ মাথা তুলতেই দেখে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত সামনে যে পালাবারও আর পথ নেই। পথজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল চেহারার এক হনুমান।

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল টোটো আর টিপু। প্রকাণ্ড হনুমানটা ওদের আরও কাছে এগিয়ে এল। তারপর বলল, হ্যাঁ সত্যিই বলল, ঠিক মানুষের মতো করে বলল, "তোমরা কেনো হামার

খোঁকাদের লেজ ধরে টানো ?”

হনুমানের মুখে মানুষের কথা শুনে ভীষণ অবাক হয়ে গেল টোটো আর টিপু। টিপু বলল, “তুমি বাংলা জানো ?”

মাথা দুলিয়ে উত্তর দিল হনুমান, “হাঁ, জানে। হামি তিন বরষ দখ্‌সিনেশ্‌ওয়ারে ছিলাম! তা এখোন বোলো, তোমরা কেনো হামার খোঁকাদের লেজ ধরে টানো ?”

হনুমানের মুখে বাংলা শুনে ওদের একটু সাহস হয়েছে। টোটো তাই বলল, “আমরা কি এমনি-এমনি টেনেছি, ছড়ায় আছে যে।”

শুনে হনুমানের সে কি হাসি! বেশ কিছুক্ষণ হেসে নেওয়ার পরে বলল, “হামিও হামার খোকাদের একটা ছড়া শিখিয়েছি। শুনবে ?” বলেই হনুমান দুলে দুলে বলতে লাগল ঃ—

আড়ি আড়ি আড়ি, কাল যাবে বাড়ি
পরশু যাবে ঘর
টোটো-টিপুর কান ধরে টানাটানি কর

ছড়াটা বলার পরেও হনুমানের দুলুনি কমল না একটুও। দুলতে-দুলতেই ও বলল, “এই ছড়াটা হামি হামার খোঁকাদের শিখিয়ে দিয়ে বলেছি, তোমরা ঝগড়া করলেই এই ছড়াটা বলবে। তারপর টোটো আর টিপুর কান ধরে মজাসে টানাটানি কোরবে।”

কথাটা কোনমতে শেষ করে হনুমান আবার হাসি জুড়ে দিল। হাসতে-হাসতে মাটিতে পড়ে যায় আর কি। শুধু গাছের নীচেই নয়, গাছের মাথাতেও হাসি। বাচ্চা-বাচ্চা হনুমানগুলো হাসতে হাসতে গাছের ডাল ধরে ঝুলতে শুরু করে দিল।

কানমলা খাওয়ার রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল টোটো আর টিপুর কাছে। ওরা কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পরে চলে গেল আস্তে-আস্তে।

সেই দিন থেকে টোটো, টিপু আর কখনো মিথ্যে-মিথ্যে ঝগড়া করেনি। সত্যি-সত্যি ঝগড়া দু'চারবার যে হয়নি তা নয়, তবে কেউ ভুলেও আর ওইঝগড়ার ছড়াটা বলেনি।



স্কুলে ভর্তির পরীক্ষা

ভোরবেলায় জোর করে ঘুম থেকে তুলে দিতেই ভীষণ রাগ হয়ে গেল সমুর। মা ওর রাগ ভাঙাবার জন্যে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, "লক্ষ্মী সোনা আমার, চটপট হাতমুখ ধুয়ে নাও, আজ তোমার পরীক্ষা, মনে নেই ?"

ঘুমে চোখ জড়িয়ে ছিল সমুর, ও হাত-পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে বলল, "আমি আর কক্ষনো পরীক্ষা দেব না।"

বাবা বললেন, "ঠিক আছে, ও আর দশ মিনিট শুয়ে নিক, তারপর উঠবে তো সমু ?"

সমু কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু মা'র হাতের বাঁধন আলগা হতেই ও লাফ দিয়ে বিছানায় পড়ে চোখ বুজল আবার। চোখ বন্ধ করলেও ঘুম এলো না আর। ও চোখ বুজে-বুজে বাবা-মায়ের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

বাবা বললেন, "বেচারার আর কি দোষ বলো, মোটে সাড়ে-পাঁচ বছর বয়েস অথচ গত আট মাস যাবত ওর ওপর কী অত্যাচারটাই না চলছে। সকালে কিণ্ডারগার্টেন, ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই মিসের প্রাইভেট ট্যুইশন, মিস চলে গেলে তোমার কাছে পড়া, তারপর সন্ধেবেলায় আমি বাড়ি ফিরলে আবার আমার কাছে—ও কেন যে এখনও পাগল হয়নি···।"

খসখসে গলায় মা উত্তর দিলেন, "তুমি চুপ করো তো, আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। এর আগে দু'টো স্কুলে হয়নি,

এটাতেও যদি না হয়! আমার হাত-পা কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।"

বাবার গলাটাও এবার খসখসে হয়ে উঠল, "সত্যি, মোটামুটি একটা ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়ার চাইতে চাকরি পাওয়াও বোধহয় সহজ।"

বাবা-মায়ের মধ্যে আরও অনেক কথা হল, সব কথার মানে বুঝতে পারল না সমু। শুধু এটা বুঝতে পারল, অনেক দিন ধরে তাকে খুব কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। সব সময় শুধু পড়-পড়, লেখ-লেখ। বেশিক্ষণ খেলতেও দেওয়া হয় না। এইসব ভাবতে-ভাবতে বাবা-মায়ের ওপর ওর খুব রাগ হয়ে গেল। ও ঠিক করল, ও আর পড়বেও না, লিখবেও না। সকাল ঠিক আটটার সময় বাবা-মায়ের হাত ধরে বার হল সমু। ঠিক ন'টার সময় স্কুলে ভর্তির পরীক্ষা শুরু হবে।

স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাবার সময় বাবা-মা সমুকে খুব খাতির করে। কানের কাছে খালি ভাল-ভাল কথা—এটা কিনে দেব, সেটা কিনে দেব। পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আইসক্রীম আর চকোলেট। ট্যাক্সিতে উঠেই মা সমুকে খুব আদর করে বললেন, "আজ খুব ভাল করে পরীক্ষা দেবে, অ্যাঁ?"

মা'র আদর শেষ হতেই বাবার আদর। "যা জিজ্ঞেস করবে টকাটক উত্তর দিয়ে দেবে, কেমন?"

সমু কারও কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইল। ওর একপাশে মা, আর এক পাশে বাবা। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে শাঁ-শাঁ করে। সমুর ট্যাক্সিতে চড়তে খুব ভাল লাগে, কিন্তু আজ ওর কিছু ভাল লাগছিল না। ও বুকের মধ্যে থুতনি চেপে আরও ছোট হয়ে গেল।

একটু বাদে মা কেমন যেন আদর-আদর করা গলায় বললেন, "হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?"

সমু কোন উত্তর দিল না। বাবা ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "বলো বলো, মাই নেম ইজ···বলো।"

সমু এবারও কোনো জবাব দিল না।

মা জিজ্ঞেস করলেন, "হাউ মেনি ডেজ মেক আ উইক?"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "হাউ মেনি লেগস এ ডগ হ্যাজ?"

সমু কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের বুকের মধ্যে থুতনি ডুবিয়ে দিল আর কিছুটা। মা ওর মুখটা ওপরদিকে তুলবার চেষ্টা করে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "সমু, টেল মি নেম্‌স অব ফাইভ পেট অ্যানিম্যালস।"

বাবা চাপা গলায় বললেন, "উত্তর দাও। উত্তর না দিলে নতুন স্কুলে তুমি ভর্তি হবে কী ভাবে! এই স্কুলটা না খুব সুন্দর, সামনে বিরাট একটা খেলার মাঠ আছে। ওই মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে তুমি খেলবে। আচ্ছা এবার বল তো, বল তো—আই অ্যাম রাউণ্ড, আই হ্যাভ টু হ্যাণ্ডস, আই টেল ইউ দ্য টাইম, হোয়াট অ্যাম আই?"

সমু এবারও কোনো উত্তর দিল না।

মা ওকে জড়িয়ে ধরে কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "সমু বলো, শুধু আজকের দিনটা। আজ পরীক্ষা হয়ে গেলে তোমাকে অনেক দিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেব। ছুটিতে একদম পড়াশুনা করতে হবে না, শুধু খেলা। আজকেই তোমাকে একটা ক্রিকেট ব্যাট কিনে দেব, আর কী নেবে বল?"

সমু এবারও কিছু বলল না।

একটু পরে বিরাট একটা স্কুলবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সিটা। ট্যাক্সি থেকে এক-এক করে নেমে পড়ল ওরা তিনজন। স্কুলের সামনে আরও অনেক বাচ্চা, ওদের সঙ্গে ওদের বাবা-মা'রা। পরীক্ষা শুরু হবে আর একটু পরে।

বাবা হঠাৎ সমুর সামনে প্রায় বসে পড়ে বললেন, "হোয়াট ইজ দ্য নেম অব দিস স্কুল?"

সমু উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

যেদিকে মুখ ফেরাল সেদিকে ওর মা ছিলেন, মা প্রায় বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াট ইজ দ্য কালার অব ইওর শার্ট?"

সমু এবারও কোনো জবাব না দিয়ে সামনের দিকে তাকাল।

তাই না দেখে বাবা চোখ-মুখ লাল করে খসখসে গলায় কী যেন বলতে গেলেই মা থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে তোমাকে এখন কিছু বলতে হবে না। স্কুলে আন্টিরা যা জিজ্ঞেস করবে তুমি তার উত্তর দেবে, যা লিখতে বলবে, তুমি তাই লিখে দেবে, কেমন?"

বহুক্ষণ বাদে মুখ খুলল সমু। "আমি কিচ্ছু বলব না। যা লিখতে দেবে আমি ইচ্ছে করে ভুল লিখব!"

তাই শুনে বাবা-মায়ের মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

একটু পরে আর সব ছেলেদের সঙ্গে লাইন দিয়ে পরীক্ষা দেবার জন্যে হলের ভেতরে ঢুকে গেল সমু। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বেরিয়ে এল হল থেকে, কিন্তু ওর মুখ দেখে কারও বোঝার উপায় নেই কেমন পরীক্ষা দিয়েছে ও!

পরীক্ষার ফল বেরুবে পনেরো দিন বাদে। এই ক'টা দিন ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে কাটালেন সমুর বাবা-মা। তারপর অবাক হয়ে দেখলেন, হাজারখানেক ছেলের মধ্যে শুধু চান্স পাওয়াই নয় একেবারে সেকেণ্ড হয়ে বসে আছে সমু।

ছেলে বড় স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে দেখে বাবা-মায়ের আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু সমুর মনে একটুও আনন্দ নেই। কেন নেই জিজ্ঞেস করেও জবাব পাওয়া গেল না বহুক্ষণ, তারপর ও নিজে থেকেই বলল, "এই স্কুলটা আমাকে না নিলেই ভাল হত।"

"সে কী! কেন রে?"

মা-র প্রশ্নে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল সমুর মুখে, তারপর ও মার আঁচলের আড়ালে মুখ লুকিয়ে বলল, "তাহলে পরের স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাবার সময় আবার আমি তোমাদের ভয় পাইয়ে দিতাম।"

তাই শুনে প্রথমে ওর মা তারপর বাবা ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন।

আসুক দেখি এবার

শমী একটা নামকরা মিশনারি স্কুলে ক্লাস টু-এ পড়ে। ক্লাস টু মানে ও যে শুধু দু-বছর ধরে এখানে পড়ছে তা নয়, চার-চারটে বছর পড়া হয়ে গেল। প্রথমে লোয়ার নার্সারি, তারপর হায়ার নার্সারি, তারপরে ক্লাস ওয়ান, তারও পরে ক্লাস টু। প্রতি বছর ও ক্লাসের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। পরীক্ষায় শুধু প্রথম হওয়াই নয়, স্পোর্টস আর ইলোকিউশনেও ও সেরা ছেলে। স্কুলে, পাড়ায় আর আত্মীয় মহলে শমীর তাই খুব নামডাক। সব জায়গাতেই ওর ডাক পড়ে সবার আগে। আশেপাশের বাচ্চাদের মুখ কালো করে দিয়ে সবাই বলে—হ দেখি শমীর মতো!

তা এই এক নম্বর ছেলে শমী সেদিন যা অপমানিত হল না! অপমানে, দুঃখে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল প্রায়। গ্রামের একটা বাচ্চা সবার সামনে ওকে একেবারে বসিয়ে দিল। ওর অপমান দেখে ঘরভর্তি লোকের সে কী হাসি! ছোটমামা তো টিপ্পুনি কেটে বলল, "কী সাহেব, মুখে কথা নেই কেন?"

ও নাকি একেবারে পাক্কা সাহেবের মতো ইংরেজী বলতে পারে। অনেকে তাই ওকে আদর করে সাহেব বলে ডাকে। কিন্তু সেদিন এই সাহেব শব্দটা কী বিচ্ছিরিই না লেগেছিল! ছোটমামা নির্ঘাত ঠাট্টা করেছিল ওর সঙ্গে। একে পাড়াগাঁর ছোট্ট একটা ছেলের কাছে অপমান, তার ওপর ছোটমামার ঠাট্টা—চোখের জল গালে গড়িয়ে পড়ার আগেই শমী একছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

ওদের স্কুলে বাংলা ধরতে গেলে পড়ায়-ই না, সেই জন্যেই ও বাংলায় কাঁচা। কিন্তু সেটা কি ওর দোষ? স্কুলে যদি বেশি করে বাংলা পড়ত, ও বাংলায় ভাল হতই। আর, ভাল হলে ছোট জাগুলিয়া গ্রামের কৌশিক নামের ওই ছেলেটা সবার সামনে দুম করে ওকে অত বড় একটা কথা বলতে পারত না।

কৌশিক গ্রামের একটা ছোট্ট স্কুলে ক্লাস টু-এ পড়ে। এক লাইন ইংরেজি জানে না, অথচ কী ডাঁট। ও নাকি যখন-তখন কবিতা লিখতে পারে। তাই শুনে ছোটপিসি বলেছিল, "ও মা! কী দারুণ ছেলে! তা তুমি আমাদের নিয়ে এক্ষুনি একটা কবিতা লিখে ফেল তো।"

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লিখতে বসে গিয়েছিল কৌশিক। সবার চোখ ওর দিকে। কী লিখছে দেখার জন্যে শমী আস্তে-আস্তে যেই না ওর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অমনি ছেলেটা ঠিক বড়দের মতো গলা করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন্ মিডিয়ামে পড়ো? বাংলা না ইংরেজি?"

শমী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, "ইংলিশ।"

ইংরেজি মাধ্যমের কথা শুনলে সবাই কেমন তারিফ করে, অথচ ছেলেটা ঠাট্টার গলায় বলেছিল, "তাহলে ত বাংলা কবিতা তোমার মাথায় ঢুকবে না, যাও এখান থেকে।"

ছেলেটার কথা শুনে ঘরভর্তি লোকের সে কী হাসি—হা-হা হো-হো হি-হি—হাসি আর থামতেই চায় না। অপমানে চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল শমীর। ঠিক সেই সময় টিপ্পুনি কেটে বসল ছোটমামা, "কী সাহেব মুখে কথা নেই কেন?"

কৌশিকরা বেড়াতে এসেছিল ওদের বাড়িতে। ওই ঘটনার পরে শমী আর বসার ঘরে ঢোকেনি। ওরা মোটে ঘণ্টা-দুয়েক ছিল, কিন্তু চলে যাবার পরেও শমী অপমানের জ্বালা ভুলতে পারল না। যে করেই হোক এর শোধ তুলতে হবে। কিন্তু কী ভাবে?

মিষ্টি মাসীর সঙ্গে শমীর খুব বন্ধুত্ব। ওর দুঃখের কথা শুনে মিষ্টি মাসী বলল, "এই-ই ব্যাপার, তা তুই ভাল করে বাংলা শিখে ফেল না চটপট, তারপর একদিন কৌশিককে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দিবি ভাল-বাংলা কাকে বলে।"

শমী থমথমে মুখে জিজ্ঞেস করল আমাদের স্কুলে ত একটুখানি বাংলা পড়ায়, ভাল বাংলা শিখব কী করে?"

"এক কাজ কর, তুই তো স্পোর্টসে ইন্টারেস্টেড, বাংলা খবরের কাগজে খেলার পাতাটা খুব ভাল করে পড়। খেলার খবরও জানা হবে, আবার ভাষাও শিখতে পারবি।"

মিষ্টি মাসীর পরামর্শটা শমীর খুব মনে ধরে গেল। এর আগে ও বাংলা খবরের কাগজ ছুঁয়েও দেখত না, এখন ঠিক উল্টোটা। বাংলা কাগজের খেলার পাতাটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে রোজ। প্রথম-প্রথম মানে বুঝতে খুব কষ্ট হত ওর, কিন্তু চেষ্টায় কী না হয়! অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই বাংলা ভাষায় ওর বেশ দখল এসে গেল।

আগে খেলার কথা বলতে গেলে গাদা-গাদা ইংরেজি শব্দ এসে যেত ওর মুখে, এখন সব বাংলা। খেলার আলোচনায় শমীর মুখে এখন এই ধরনের কথা শোনা যায়ঃ খেলার ফলাফল গোলশূন্য ; আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়টা দারুণ খেলছে; ফুটবলে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের বদলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার দিকে জোর দেওয়া দরকার ; বৃষ্টির জন্য খেলা মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়েছে ; ইস্! শেষ বাঁশি বাজার আগে ভারত গোল খেয়ে গেল ; কর্দমাক্ত মাঠে ইস্টবেঙ্গল খেলে ভাল ; মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা মানেই স্নায়ুর যুদ্ধ।

এত খেটেখুটে এত ভাল-ভাল বাংলা শিখেছে শমী, কিন্তু বড়রা ওর মুখে এসব কথা শুনলেই মুখ টিপে হাসে। কেন যে হাসে, শমী কিছুতেই বুঝতে পারে না। তবে ও বাংলা ভাষার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে জোর কদমে।

এ-ব্যাপারে ওকে বাহবা দেয় শুধু মিষ্টি মাসী। মাসী সেদিন বলল "বাহ্! দারুণ-দারুণ সব বাংলা শিখেছিস তো, এবার একটু-আধটু কবিতা লেখা প্র্যাকটিস কর।"

লাজুক-লাজুক মুখে উত্তর দিল শমী, "কবিতার অনুশীলনও শুরু করেছি। একটা শুনবে?"

"বল্।"

"মাঠ কর্দমাক্ত
খেলা পরিত্যক্ত।"

শমীর কবিতা শুনে মিষ্টিমাসী ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "চমৎকার হয়েছে। সামনের মাসে তোর জন্মদিন, জন্মদিনে নেমন্তন্ন করব কৌশিককে। তখন কবিতার লড়াইয়ে ওকে হারিয়ে দিতে পারবি না?"

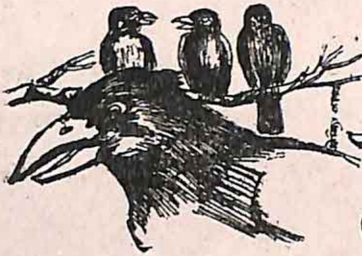
শমী একপাশে মাথা অনেকটা কাত করে বলল, "হুঁ-উ-উ। ও আমার কাছে কীভাবে হেরে যাবে জানো—"

"কী ভাবে?"

শমী কপালে ভাঁজ ফেলে একটু ভেবে নিয়ে বলল, "ও আমার কাছে হারবে ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায়।"

ওর কথায় মিষ্টিমাসী ঝলমল করে হেসে উঠে বলল, "শাবাশ।"

———



খাবার চুরির শাস্তি

টুম্পাদের বাড়ির উঠোনে একটা মস্ত বড় নিমগাছ আছে। সেই গাছের সবুজ মাথা কালো করে থাকে অনেকগুলো কাক।

কাকগুলো আগে খুব ভালো ছিল, এখন খুব দুষ্টু হয়ে গেছে। আগে কেমন গাছের মাথায় আর ছাতের কার্নিশে চুপ করে বসে থাকত। উঠোনে ভাত, মুড়ি কিংবা পাঁউরুটির টুকরো ছড়িয়ে দিলে সবাই মিলে লক্ষ্মী হয়ে খেত, একটুও দুষ্টুমি করত না, মা-কাকরা বাচ্চা কাকদের ঠোঁটে করে খাইয়ে দিত।

খাওয়া হয়ে গেলে সবাই উঠোনের কলে জল খেয়ে, ঠোঁট ধুয়ে আবার নিমগাছে আর কার্নিশে গিয়ে বসত। এখন ঠিক তার উল্টোটা। খাবার দিলেই সবাই কাড়াকাড়ি করে খায়, মারামারি করে। রান্নাঘর থেকে এটা-সেটা চুরি করে নিয়ে পালায়। টুম্পা কদ্দিন বারণ করেছে, কিন্তু কেউ শোনে না, উল্টে ঠোঁট ফাঁক করে হাসে, ইয়ার্কি করে, অসভ্যের মতো পা দিয়ে কান চুলকোয়।

টুম্পা একদিন রেগে বলল, "দাঁড়াও, তোমাদের মজা দেখাচ্ছি।"

ছোট কাকগুলো খা-খা করে হেসে পায়ের বুড়ো নখ দেখিয়ে বলল, "আমাদের ধরতেই পারবে না, তোমার তো পাখা নেই, ধরতে এলেই উড়ে পালাব।"

সত্যিই তো টুম্পার পাখা নেই! ইস্, হাতদু'টোর বদলে যদি দু'টো পাখা থাকত!

টুম্পার মাসতুতো ভাই বুল্টু বলল, "পাখা নেই তো কী হয়েছে, তোকে আমার গুলতিটা দেব, টিপ করে মারবি, তখন মজা টের পাবে।. ওদের কথা কাকগুলো ঘাড় কাত করে শুনল, তারপরে সবাই একসঙ্গে খা-খা করে হেসে উঠল। দেখে বুল্টুরও খুব রাগ

হয়ে গেল। ও একছুটে বাড়ি থেকে নিয়ে এল গুলতিটা।

বুলটু আর টুম্পা গুলতি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে হাত ব্যথা করে ফেলল, কিন্তু একটা কাককেও মারতে পারল না, কাকগুলো উড়ে-উড়ে পাশ কাটিয়ে গেল। ওদের দু'জনকে হাঁপিয়ে যেতে দেখে কাকগুলোর সে কি হাসি! হাসতে-হাসতে পাখা দিয়ে তালি বাজিয়ে চেঁচাতে লাগল, "হুয়ো, হুয়ো, বলেছিলাম না আমাদের কিছু করতে পারবে না, তোমাদের তো পাখা নেই।"

বারবার পাখা নেই, পাখা নেই শুনে আর কিছু করতে না পেরে টুম্পার চোখে জল এসে গেল। ও কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "পাখা নেই তো কী হয়েছে? হাতের বদলে পাখা থাকলে কী আইসক্রিম খেতে পারতাম?"

শুনে কাকগুলো চুপ করে গেল। কাকগুলো যদি চুপ না করে আরো দুচারটে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করত, তাহ'লে ঠিক টুম্পার চোখের জল গাল গড়িয়ে পড়ত। টুম্পার একটুতেই ভীষণ কান্না পেয়ে যায়। মা-ঠাকুমা একটু বকলেই কেঁদে ফেলে। এই কাকগুলোকে টুম্পা আসলে খুব ভালবাসে, সেই জন্যে ওর আজ বেশি করে কান্না পাচ্ছিল।

মার কাছে টুম্পা শুনেছে ও একবছর বয়স থেকেই এই কাকগুলোকে ভালবাসে। ও জীবনে প্রথম এই কাকদের কথাই শেখে। প্রথমে 'মা' বলেনি 'বাবা' বলেনি, বলেছিল, 'কঅক', তারপরে 'কাক'।

ঘরে বসে খেতে চাইত না, আঙুল দিয়ে নিমগাছ দেখাত, মা নিমগাছের কাছে নিয়ে গেলে ও আঙুল তুলে কাকদের খেতে দিতে বলত। মা দিলে তবে ও খেত। টুম্পা যখন হাঁটতে শিখল, তখন ও নিজে গিয়ে কাকদের খেতে দিয়ে আসত। কাকরা ওর চারদিকে হেঁটে হেঁটে খেত। একটা কাক আবার খাওয়া হয়ে গেলে ওর কাঁধে এসে বসত। ছোটমামা ক্যামেরা দিয়ে একটা ছবি তুলেছিল। ছবিটা আজও আছে, কী মজা লাগে দেখতে!

সেই কাকগুলো আজকাল ভীষণ দুষ্টু হয়ে গেছে। যখন-তখন

রান্নাঘরে, খাবারঘরে ঢুকে চুরি করে। শুধু চুরি নয় ডাকাতিও। হয়তো মা, ঠাকুমা, কাকীমা অন্যমনস্ক হয়ে কাজ করছে, একটা কাক কোত্থেকে উড়ে এসে হয় মাছ-মাংস নয়, রান্না-করা তরকারি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পালাল।

ধর, ধর, ধর—কে ধরবে। কাক ততক্ষণ নিমগাছে, পায়ের আঙুলে খাবার ধরে ঠুকরে-ঠুকরে খাচ্ছে। খেয়ে কয়েকবার আহ্লাদী গলায় 'কঅঅ, কঅঅ' করে ডেকে বলে, "কী টুম্পা, আর আমাদের গুলতি দিয়ে মারতে আসবে?"

শুনে টুম্পার ভীষণ রাগ হয়ে যায়, ইচ্ছে করে তক্ষুনি গিয়ে কাকটার কান মলে দেয়। কিন্তু কী করে যাবে? টুম্পার তো পাখা নেই।

একদিন মা চিংড়িমাছের মালাইকারি রাঁধছিল, এত সুন্দর গন্ধ উঠছিল যে টুম্পার খিদে পেয়ে গিয়েছিল ভীষণ। বারবার রান্নাঘরে এসে মা'র আঁচল ধরে দেখছিল চিংড়িগুলো কী সুন্দর লাল হয়ে উঠেছে।

মা ওর গাল ধরে আদর করে বলল, "আজ তোমার জন্যে মালাইকারি রাঁধছি টুম্পা, তাড়াতাড়ি চান করে এসো, গরম-গরম খাবে।" টুম্পার এমনিতে চান করতে ভাল লাগে না কিন্তু আজ মালাইকারি খাবার লোভে ছুটে চলে গেল চান করতে। এদিকে মা ঢুকেছে ভাঁড়ার ঘরে মসলাপাতি আনতে।

রান্নাঘরে কেউ নেই দেখে একটা কাক উড়ে এসে কড়াই থেকে একটা চিংড়ি তুলে নিয়ে পালাল। কী সাহস! ঠোঁট পুড়ে যাবার ভয় পর্যন্ত নেই। মা'র হৈ-হৈ শুনে টুম্পা বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে এই ব্যাপার। কাকটার ওপরে ভীষণ রাগ হল, চিংড়ির কষ্টে ভীষণ কান্না পেল, কিন্তু কী আর করবে!

তিনটে ইঁট ছুঁড়ল কাকটার দিকে, একটাও ওর গায়ে লাগল না। কাকটা কয়েকবার শুধু এ-ডাল থেকে ও-ডাল উড়ে গেল, তারপরে হুশ করে চলে গেল ছাতের কার্নিশে, সেখানে বসে তারিয়ে-তারিয়ে চিংড়ি খেতে লাগল।

খাবারে কাক মুখ দিলে তা আর খাওয়া যায় না, মা তাই রাগ করে

শোভাকে বলল, "যা এগুলো নিয়ে সব নর্দমায় ফেলে দিয়ে আয়।"

টুমপা মাকে কত বোঝাবার চেষ্টা করল, "মা, কাক তো শুধু একটা নিয়েছে, বাকিগুলো তো খারাপ হয়নি। আমাদের স্বাস্থ্যের বইতে আছে গরম-গরম খেলে অসুখ হয় না।"

মা টুম্পার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দুম্-দুম্ করে পা ফেলে বাবার ঘরের সামনে গিয়ে বলল, "এখন আর তোমাকে চা দিতে পারব না, উনুন খালি নেই!"

টুম্পা তাকিয়ে দেখে উনুন তো খালি, উনুনে কিচ্ছু নেই। মা'র রাগ হয়েছে দেখে ও আর কিচ্ছু না বলে ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকল।

চিংড়ির মালাইকারি খেয়ে ওই কাকটার এত লোভ হয়ে গিয়েছিল যে, সারাদিন রান্নাঘরের জানলায় এসে বসে থাকে আর কা-কা করে। ওর কাছে মালাইকারির গল্প শুনে বাকি কাকগুলোও লোভীর মতো রান্নাঘর আর খাবারঘরে এসে উঁকি মারে সব সময়। কিন্তু আজকাল মা-কাকীমা-ঠাকুমারা খুব সাবধান হয়ে গেছে, খাবার-দাবার সবকিছু তার-লাগানো আলমারির মধ্যে রেখে দেয়। কিছু না পেয়ে কাকগুলো শেষে দারুণ রেগে গেল। রেগে গিয়ে ওরা নতুন-নতুন দুষ্টুমি শুরু করে দিল।

ওরা তো কাঁচা তরিতরকারি খায় না, কিন্তু নষ্ট করার জন্যে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। ছাতে বারান্দায় দড়িতে জামাকাপড় মেলে দেওয়া আছে, ওরা ঠোঁট ঘষে, পা ঘষে নোংরা করে দেয়। শোবার ঘরে কেউ নেই, ওরা জানলা দিয়ে ঘরে এসে সাদা বিছানার ওপরে নোংরা পায়ে হাঁটে। চোখের সামনে তিনদিন তিনটে চামচ তুলে নিয়ে গেছে।

টুম্পা কদ্দিন গিয়ে ওদের বলেছে, "তোমরা কেন এমন দুষ্টুমি করো? আর দুষ্টুমি না করে ভালো হয়ে থাকো, তোমাদের সবাইকে পেট ভরে খেতে দেব!"

সেদিনের সেই কাকটা বলে উঠল, "চিংড়ির মালাইকারি খেতে দেবে?"

"হ্যাঁ দেব।"

"সত্যি দেবে?"

"বলছি তো দেব!"

"সব্বাইকে?"

"হ্যাঁ, সব্বাইকে।"

আর একটা কাক ওদিকের ডাল থেকে বলে উঠল, "নারে, মিথ্যে কথা বলছে, ওরা চিংড়ি খাবে আর আমাদের দেবে খোসাগুলো।"

শুনে টুম্পার ভীষণ রাগ হয়ে গেল, ও চেঁচিয়ে বলল, "আমি মিথ্যে কথা বলি না, মিথ্যে বলা পাপ, মিথ্যে বলা খারাপ।"

ওর কথা শুনে কাকগুলো অসভ্যের মতো খা-খা-খা করে হেসে উঠে চ্যাচাতে শুরু করে দিল, "মিথ্যুক-মিথ্যুক, টুম্পা মিথ্যুক।" শুধু-শুধু মিথ্যুক বললে রাগ হয়ে যায় না? টুম্পার খুব রাগ হয়ে গেল, কিন্তু ও আর কী করবে! কাকগুলো তো ওই উঁচুতে। ও মুখ কালো করে রমুদের বাড়িতে চলে গেল।

কাকগুলোর অসভ্যতার কথা শুনে রমু বলল, "আমাদের দেশের বাগানে একটা কাকাতাড়ুয়া আছে, তাকে দেখে সব কাক পালায়। তুই একটা কাকতাড়ুয়া তৈরি করে তোদের নিমগাছের সামনে রেখে দে, দেখবি কাকগুলো কেমন ভয় পাবে।"

কাকতাড়ুয়া কেমন করে তৈরি করতে হয়, টুম্পা মন দিয়ে শুনে বাড়িতে এসে বানালো। মানুষের মাথার মতো দেখতে একটা কালো কুচকুচে হাঁড়িতে চুন দিয়ে এতবড় দুটো চোখ আঁকল, এত বড় মুখ, তাতে রাক্ষসদের মতো বড়-বড় দাঁত। দু'টো লাঠি চৌকো করে বেঁধে তার ওপরে বাবার একটা পাঞ্জাবি জড়িয়ে দিল, মাথার দিকে হাঁড়িটা। যা দেখতে হয়েছে না, দেখলেই ভয় লাগে।

চুন একটু বেঁচেছিল, টুম্পা তাই দিয়ে মাথার ঠিক ওপরে আর একটা মুখ তৈরি করে দিল, এই মুখটার দাঁতগুলো আরও বড়-বড়। কাকগুলো ওপর দিয়ে যাবার সময় দাঁতগুলো দেখে ঠিক ভয় পাবে।

সূর্য ডুবে যাবার পরে চারদিক যেই না অন্ধকার হয়ে গেছে, টুম্পা আস্তে-আস্তে নিমগাছের গোড়ায় কাকতাড়ুয়াটাকে রেখে এল। কাকেরা সন্ধ্যে হলেই ঘুমিয়ে পড়ে, তাছাড়া ওরা নাকি রাত্তিরে দেখতে পায় না। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলে তখন মজা টের পাবে।

ভোর হতে না হতেই কাকের ডাকে টুম্পার ঘুম ভেঙে গেল। কী ডাক, ডাক না তো চিৎকার, একসঙ্গে একশোটা কাক কা-কা করছে। টুম্পা ছুটে বাইরে গেল। দেখে, অনেকগুলো কাক কাকতাড়ুয়ার মাথা আর দুই হাতের ওপরে বসে। বাকি কাকগুলো গোল হয়ে উড়ছে! টুম্পাকে দেখেই ওদের কা-কা আরও বেড়ে গেল।

ছোট কাকগুলো চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল, "আমরা কী গ্রামের কাক, যে কাকতাড়ুয়া দেখে ভয় পাব, আমরা শহরের কাক, ট্রামের তারে বসি, ময়দানে গিয়ে খেলা দেখি, ইংরেজি বলতে পারি, কারুকে কেয়ার করি না, "কা-কা-কা, খা-খা-খা, হা-হা-হা।"

রাগে-দুঃখে টুম্পার চোখে জল এসে গেল। দৌড়ে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ। মা ডাকল, "টুম্পা, সোনা আমার, সকাল হয়ে গেছে, এবার ঘুম থেকে ওঠো।"

টুম্পা বলল, "না।"

ঠাকুমা বলল, "টুম্পি, আমার পুজো হয়ে গেছে, প্রসাদ খাবি না?"

টুম্পা বলল, "না।"

ঠিক তিনদিন পরে টুম্পাদের বাড়িতে কৃষ্ণনগরের দিদিমা এলেন। দিদিমাকে কী সুন্দর দেখতে, মাথায় ধপধপে সাদা চুল, পরনে লালপেড়ে শাড়ি, মুখভর্তি পান। দিদিমার পানের গন্ধ আর গল্প শুনতে ভীষণ ভাল লাগে টুম্পার।

দিদিমা এলেই বাবা নিজেই বাজারে যায় আর ওল, কচু, কচুশাক, কলমিশাক, থোড়, মোচা এইসব নিয়ে আসে। দিদিমার নাকি এইসব খেতে খুব ভাল লাগে। সেদিন বাবা বাজার থেকে এত বড় একটা ওল নিয়ে এল, কোথাকার ওল, খেতে নাকি খুব ভাল।

মা খুব সুন্দর করে রাঁধল। কিন্তু খাবার টেবিলে ওল মুখে দিয়েই সবাই চেঁচাতে শুরু করে দিল, "গলা চুলকোচ্ছে, গলা চুলকোচ্ছে, উরিব্বাস্।"

দিদিমার নাকি কোনোদিন গলা চুলকোয় না, সেই দিদিমাও খুক-খুক করতে করতে বলল, "এ কী এনেছিস রে, এ যে দেখছি বুনো ওল, তেঁতুল নেই রে?"

তেঁতুল এল, বাবা আবার ওষুধ এনে দিল, সেই সব খেয়ে অনেকক্ষণ পরে সবার গলা চুলকোনো বন্ধ হল।

মা চেঁচিয়ে শোভাকে বলল, "শোভা, যা তো এক্ষুনি গিয়ে ওলের ডালনাটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আয়।"

শোভা এককথা দশবার না বললে শোনে না, আরও নবার শোনার জন্যে কোনও উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

মা আরও চেঁচিয়ে বলল, "এর চাইতে নন্তু বাজারে গেলে অনেক ভাল হত, যারা জিনিসপত্তর চেনে না, তাদের বাজারে যাবার কী দরকার!"

বাবা বলল, "আমি কী করে বুঝব, আমি কি···।"

মা থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি চুপ করো, আমি তোমাকে কিছু বলিনি।"

* * *

দুপুরবেলা। সবাই যে-যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। দু'দিন বাদে বিশ্বকর্মা পুজো, রবিদারা রাস্তায় হামানদিস্তে দিয়ে কাঁচ গুঁড়ো করছে মাঞ্জা দেবে বলে। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই।

মা'র পাশে শুয়ে থাকতে-থাকতে টুম্পার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ও পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপরে সোজা চলে গেল রান্নাঘরে। রান্নাঘর থেকে ওলের ডালনাভর্তি ডেকচিটা তুলে এনে খাবারঘরে টেবিলের ওপরে রেখে সবকটা জানলা খুলে দিল হাট করে।

খাবারঘরের জানলার সামনাসামনি নিমগাছ। কাকগুলো গাছে বসে ঝিমোচ্ছিল, জানলা খুলতেই চোখ বড়-বড় করে তাকাল। টুম্‌পা ওদের না-দেখার ভান করে চলে গেল ওই কোণের ঘরটায়।

ওখান থেকে দরজা একটুখানি ফাঁক করে দেখে, সবকটা কাক খাবার ঘরের তিনটে জানলায় এসে বসেছে। কাকগুলো এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে টুপটুপ করে লাফিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। তারপরে সবাই ঠোঁটে করে একটুকরো ওল নিয়ে আনন্দে উড়ে গেল নিমগাছে।

টুম্‌পা আরও কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় এসে দেখে নিমগাছে হুলুস্থুল বেধে গেছে, কাকগুলো খালি এ-ডাল ও-ডাল করছে, গাছের মাথার ওপরে ঘুরছে গোল হয়ে, কেউ-কেউ পা দিয়ে গলা চুলকোচ্ছে।

সামনের বাড়ির কাজলদিরা সিমলায় বেড়াতে গেছে। ওদের লম্বা ঝুল-বারান্দায় কাকগুলো উড়ে এসে সার দিয়ে বসল, যেন নেমন্তন্ন খেতে বসেছে। তারপরে সে কী ঠোঁট চুলকোনো! খস্‌খস্, খস্‌খস্, খস্‌খস্।

রেলিংয়ের লাল সিমেণ্টে কাকগুলো খালি ঠোঁট ঘষে যাচ্ছে। টুম্‌পা হাততালি দিয়ে উঠল, "কী মজা! কী মজা! আর চুরি করবে? আর দুষ্টুমি করবে? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করবে?"

ঠোঁট চুলকোতে-চুলকোতে লাল সিমেণ্টের রং উঠে কাকগুলোর ঠোঁট লাল হয়ে উঠল। ছোট-ছোট গোল চোখ ভর্তি হয়ে গেল জলে। সবাই কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "টুম্‌পা, আমাদের বাঁচাও, আর আমরা কোনোদিনও দুষ্টুমি করব না, তোমার কথা শুনব, লক্ষ্মী হয়ে থাকব, সত্যি বলছি।"

টুম্‌পা তো আসলে কাকদের খুব ভালবাসে, তাই বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারল না। কাকদের কষ্ট দেখে ওর কষ্ট হতে লাগল। ও বলল, "সত্যি বলছ তো আর চুরি করবে না, দুষ্টুমি করবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে?"

কাকগুলো একসঙ্গে বলে উঠল, "সত্যি বলছি, সত্যি বলছি, বিশ্বাস

করো সত্যি বলছি।”

টুম্‌পা তখন বড় এক বাটি তেঁতুলের জলে বাবার আনা ওষুধ মিশিয়ে বারান্দায় এনে বলল, “সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়াও, তারপরে এক-এক করে দু-চুমুক করে এটা খেয়ে নাও।”

কাকেরা লক্ষ্মী কাকের মতো লাইন দিয়ে দাঁড়াল, তারপরে একজন-একজন করে সবাই জলটা খেয়ে নিল। একটু পরেই ওদের ঠোঁট চুলকোনো বন্ধ হয়ে গেল একদম।

সেই থেকে কাকগুলো ভীষণ ভাল হয়ে গেছে, কেউ আর কোনোদিন চুরি করেনি, দুষ্টুমি করেনি। টুম্‌পার সঙ্গে ওদের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, টুম্‌পা যা বলত তাই শুনত সবাই।

———

জুগো, কপ্‌কা এইসব



শানু এইটুকুন ছেলে। ভীষণ দুষ্টু। টলমল-টলমল করে দৌড়য়, ধুপ-ধুপ করে পড়ে, খিলখিল করে হাসে। শানু জলকে বলে "গ", কলাকে বলে "কপ্‌কা", জুতোকে বলে "জুগো", তবে দিদিকে বলে "দিদ্‌দি"।

দিদির নাম সোনিয়া। ঠিক পাঁচবছর বয়েস। নিজে সব কথা ঠিক-ঠাক বলতে পারে না তো, তাই ভাইয়ের কথা শুনে খুব হাসে। মাও হাসে, বাবাও হাসে।

বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেই সোনিয়া ছুটে গিয়ে বলে, "জানো, ভাই না জলকে বলে 'গ', মাছকে বলে মাম।"

শুনে সবাই অবাক হয়ে বলে, "ওমা! তাই নাকি! ডাকো তো শানুকে। শানু, এই শানু।"

শানুর কথা শুনে-শুনে বাড়ির সবাই এখন শানুর মতো কথা বলে। জল খাবার দরকার হলেই বাবা বলে, "কই, এক গ্লাস গ দাও তো।"

মা অমনি এক গ্লাস জল এনে দেয়।

বাবা জুতো পরে শোবার ঘরে ঢুকলে মা বলে, "এ মা, সাতরাজ্যের ধুলো শোবার ঘরে ঢোকালে তো, যাও জুগো বাইরে খুলে এসো।'

বাবা তখন বাইরে জুতো খুলে রেখে আসে।

বাজারে যাবার সময় রাধু জিজ্ঞেস করে, "আজকে কি মাম কিনব—রুই না চিংড়ি? কী কপ্‌কা—সিঙ্গাপুরী না মর্তমান?"

মা তখন বলে দেয় কী মাছ কিনতে হবে, কী কলা আনতে হবে। বাড়ির কেউ আর এখন মাছকে মাছ বলে না, কলাকে কলা বলে না, জুতোকে জুতো বলে না, শানু যা বলে সবাই তাই বলে।

শানুর নতুন-নতুন কথা দিন-দিন আরও বেড়ে যায়। সবাই এখন

গ্লাসকে "গস" বলে, বেলুনকে "এলু" খবরের কাগজকে "তাকু" বলে। কিন্তু রোজরোজ এত নতুন-নতুন কথা বললে সবাই কি সব মনে রাখতে পারে ?

শান্নু কি বলছে বাবা অনেক সময় বুঝতেই পারে না। ঠাকুমা হাসতে-হাসতে বলে, "তুই কি আর কথা বলতে শিখবি না ?"

মা দুবার "কী ? কী ?" করে তবে বুঝতে পারে। শান্নুর কথা একবারেই শুধু বুঝতে পারে শান্নুর দিদ্‌দি সোনিয়া। সোনিয়া সব সময় ওর সঙ্গে থাকে তো, সেইজন্যে। বাবা, মা আর ঠাকুমা শান্নুর কথা বুঝতে না পারলে সোনিয়া বুঝিয়ে দেয়।

বাবা বলে, "সোনিয়া তুমি এক কাজ করো। তুমি তো এখন লিখতে শিখেছ, তুমি একটা খাতায় শান্নুর কথাগুলো লিখে রাখো। আমরা যখন শান্নুর কথা বুঝতে পারব না তখন খাতাটা দেখে নেব। তবে খাতাটা ওই উঁচু টেবিলের ওপরে রাখবে, নীচে রাখলে শান্নু ছিঁড়ে দেবে।"

কথাটা সোনিয়ার খুব পছন্দ হল। ও ছুটে গিয়ে লিখতে বসে গেল ওর লাল খাতা আর নীল পেনসিল নিয়ে। ওর মুখের ওপরে একমাথা চুল বারবার উড়ে এসে পড়ছিল, ও তখন এক হাতে চুল চেপে রেখে লিখতে লাগল। এমনসময় শান্নু কোত্থেকে ছুটে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ঝুলতে শুরু করল দুলে-দুলে।

অন্যসময় হলে সোনিয়া ওকে আদর করত, ওর সঙ্গে খেলা করত, কিন্তু এখন ও লিখছে তো, তাই চেঁচিয়ে মাকে ডেকে বলল, "মা শিগ্‌গির ভাইকে এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি এখন লিখছি।"

মা এসে শান্নুকে নিয়ে গেল।

সোনিয়া অনেকক্ষণ ধরে লিখল, তারপরে বাবার কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, এই দেখ লিখেছি।"

সোনিয়া লিখেছে—শান্নু জলকে বলে 'গ' বেলুনকে বলে 'এলু' খবরের কাগজকে বলে 'তাকু'।

শান্নু যা-যা বলে, সোনিয়া সব লিখেছে। সবার শেষে বড়-বড় করে

লিখেছে, ইতি সোনিয়া। সব দেখে বাবা বলল, "বাহ্, খুব সুন্দর হয়েছে। এবার আমরা শান্তুর কথা বুঝতে না পারলেই খাতাটা দেখে নেব। বাবা নীল পেনসিলটা নিয়ে লাল খাতাটার ওপরে বড়-বড় করে লিখে দিল—"শান্তুর কথা"।

সোনিয়া খাতাটা মাকে দেখিয়ে, ঠাকুমাকে দেখিয়ে, উঁচু টেবিলের ওপরে রেখে দিল। একদিন সক্কালবেলা মা বলল, "সোনিয়া তুমি শিগ্‌গির মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।"

ও জিজ্ঞেস করল, "কেন, মা ?"

মা বলল, "সে কী, তোমার মনে নেই ? আজকে তোমার তো স্কুলে ভর্তি হবার কথা।"

সত্যিই তো। সোনিয়ার একদম মনে ছিল না। স্কুলে ভর্তি হবার কথা শুনে ওর খুব আনন্দ হল। মিন্টু, টাবলু, রুমকিদি —সবাই স্কুলে পড়ে। স্কুলের জামা পরে ওরা রোজ সকালে স্কুলে যায়। ওদের দেখে-দেখে সোনিয়ারও স্কুলে যাবার ইচ্ছে হয় ভীষণ। কদ্দিন বাবাকে বলেছে, মাকে বলেছে, "আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দাও। আমিও ওদের মতো স্কুলে যাব।"

শুনে বাবা বলেছে, "তুমি এখন একটু ছোট আছ তো, আর একটু বড় হলেই স্কুলে ভর্তি করে দেব।"

মা বলেছে, "এই তো, সামনের জান্নুয়ারী থেকেই স্কুলে যাবে।" জান্নুয়ারী কবে আসবে ? মা তখন ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কোন মাসের পরে কোন্ মাস আসে।

রাঙাপিসি যে ফ্রকটা দিয়েছিল, মা সেই ফ্রকটা সোনিয়াকে পরিয়ে দিল, তারপরে আদর করে বলল, "তুমি স্কুলে গিয়ে একটুও দুষ্টুমি করবে না, লক্ষ্মী হয়ে থাকবে। তোমাকে দিদিরা যা জিজ্ঞেস করবেন, সব কথার উত্তর দেবে, কেমন ?"

সোনিয়া বলল, "আচ্ছা।"

মা বলল, "যাও ঠাকুমাকে প্রণাম করে এসো।"

সোনিয়া ঠাকুমাকে প্রণাম করল।

ঠাকুমা বলল, "তুগ্‌গা, তুগ্‌গা, এবার মাকে নমো করো!"

মা বলল, "এবার বাবাকে।"

বাবা বলল, "এবার শানুকে আদর করো।"

শানু বারান্দার রেলিংয়ের মধ্যে তুই হাত, তুই পা ঢুকিয়ে দিয়ে পাশের বাড়ির টিয়া পাখিটার সঙ্গে গল্প করছিল। সোনিয়া ভাইকে আদর করে বাবার হাত ধরে দাঁড়াল।

দিদি আর বাবাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেই শানু টলমল করে ছুটে এসে হাত নেড়ে বলল, "তা-তা।"

কেউ বাড়ি থেকে বেরুলেই শানু টা-টা করে।

বাবা বলল, "শানু, তোমার জন্যে কী আনব?"

শানু বলল, 'এলু'। এলু মানে বেলুন।

"আর?"

শানু বলল, 'আত্‌'।

সোনিয়া বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বল তো, আত্‌ মানে কী?"

"কী?"

"আত্‌ মানে সন্দেশ, ভাই কাল থেকে বলছে।"

"তুমি খাতায় লিখে রেখেছ?"

"না তো, এসে লিখব।"

রাস্তায় নেমে সোনিয়া আর ওর বাবা মিনিবাসে উঠল। বাসে উঠেই সোনিয়া গল্প শুরু করে দিল। কত গল্প, গল্প আর ফুরোয় না। টাবলুদের স্কুলটা কী সুন্দর। মিনু আর রুম্‌কিদিদের স্কুলটাও খুব ভাল। আমাদের স্কুলটা কেমন? আমাদের স্কুলে খেলার মাঠ আছে? রাস্তার তুধারে লম্বা-লম্বা গাছ আছে? আমাদের স্কুলে বন্ধু আছে কজন?

বাসে এত গল্প তো, কিন্তু সোনিয়া যেই না স্কুলে ঢুকল, অমনি ওর সব সব কথা থেমে গেল। খালি বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

বাবা বলল, "দেখ-দেখ, তোমাদের স্কুলটা কী সুন্দর! কতো বড় লাল বাড়ি। এই দেখ কী সুন্দর খেলার মাঠ, দোলনা।

ওই দেখ কত গাছ। দেখ, ভাল করে দেখ। স্কুলে এলে চুপ করে থাকতে নেই, ভয় পেতে নেই। এখানে সবাই ভাল। সবাই তোমাকে ভালবাসে।"

বাবা সোনিয়াকে নিয়ে হেড্‌মিস্‌ট্রেসের ঘরে ঢুকল।

হেড্‌মিস্‌ট্রেস বাবাকে বললেন, "আসুন-আসুন।"

সোনিয়াকে বললেন, "এসো-এসো।"

ঘরটার তিনদিকে আলমারি, আলমারিতে কত বই। দেয়ালে রঙিন ম্যাপ, টেবিলের ওপরে চীনামাটির গ্লাসে কত পেনসিল—লাল, নীল, সবুজ, হলুদ। সোনিয়া পেনসিলগুলো দেখছিল।

বড়মাসীর মতো দেখতে হেড্‌মিস্‌ট্রেস কী ভাল, সোনিয়াকে আদর করে বললেন, "তুমি পেনসিল নেবে, এই নাও।"

সোনিয়া প্রথমে নিতে চায়নি, বাবা বললে তবে নিল।

হেড্‌মিস্‌ট্রেস বললেন, "এবার তোমার নাম বলো।"

সোনিয়া নাম বলল। উনি তখন বললেন, "কী লক্ষ্মী মেয়ে।"

আস্তে-আস্তে সোনিয়ার সঙ্গে ওঁর খুব ভাব হয়ে গেল। উনি কত কথা জিজ্ঞেস করলেন, সোনিয়া সব কথার উত্তর দিল। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা সোনিয়াকে বলে দিয়েছিল তো দিদিরা যা জিজ্ঞেস করবে, সব কথার উত্তর দেবে, সোনিয়া তাই একবারও চুপ করে থাকেনি। হেড্‌মিস্‌ট্রেস সোনিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বলো তো ওয়াটার মানে কী।"

সোনিয়া আস্তে-আস্তে বলল, "গ"।

উনি বুঝতে পারলেন না। একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা এবার বলো তো ফিশ মানে কী?"

সোনিয়া এবার জোরে-জোরে উত্তর দিল, "ফিশ মানে মাম্‌।"

বলতেই বাবা হো-হো করে হেসে উঠল। হাসি থামলে হেড্‌মিস্‌ট্রেসকে বলল, "ওর ছোটভাই এখনও কথা বলতে শেখেনি, জলকে গ মাছকে মাম বলে, তাই শুনে-শুনে সোনিয়াও ভুল করে ফেলেছে।"

তারপরে সোনিয়াকে বলল, "শানু তো ছোট, তাই ছোটদের মতো কথা বলে, তুমি এখন বড় হয়েছ, বড়দের মতো কথা বলো।"

শুনে সোনিয়ার খুব রাগ হয়ে গেল। ও বলল, "আমি তো বড়দের মতই কথা বলছি। বড়রাও তো জলকে 'গ' বলে। তুমি মাকে বলো না—কই, এক গ্লাস 'গ' দাও? মা অমনি তোমাকে জল এনে দেয়।"

সোনিয়ার কথা শুনে বড়মাসীর মতো দেখতে হেড্‌মিস্‌ট্রেস ফিক্ করে হাসলেন। আর বাবা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

একটু চুপ করে থাকার পর বাবা হেসে বলল, "সত্যিই তো। তুমি ঠিক বলেছ। আর আমি ছোটদের মতো কথা বলব না, তুমিও বলবে না, কেমন?"

হেড মিস্‌ট্রেস বললেন, "সোনিয়া, তুমি তো এখন স্কুলে ভর্তি হলে, ভাইকে বড়দের কথা শিখিয়ে দেবে, আর বড়দের বলবে বড়দের মতো কথা বলতে, পারবে তো?"

সোনিয়া বলল, "পারব।"

স্কুলে ঢোকার সময় সোনিয়ার কী ভয় করছিল, কিন্তু বাড়ি ফেরার মুখে ওর খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, আমার স্কুলের বন্ধুরা কোথায়?"

বাবা বলল, "যখন তুমি বইখাতা নিয়ে রোজ স্কুলে আসবে, তখন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে।"

বাড়ি ফিরে সোনিয়ার আর স্কুলের গল্প শেষ হতে চায় না। ইস্, স্কুলটা কী সুন্দর, বড়মাসীর মতো দেখতে হেড্‌মিস্ট্রেস কী ভাল, ওকে কত বড় একটা লাল পেনসিল দিয়েছে। সোনিয়া সবার সঙ্গে স্কুলের গল্প করল—মা'র সঙ্গে, ঠাকুমার সঙ্গে; মিন্টু, টাবলু আর রুম্‌কিদিদের সঙ্গে।

শেষকালে ও শানুর সঙ্গেও স্কুলের গল্প শুরু করে দিল। শানু কিছু বোঝে না, কিন্তু বড়-বড় চোখ করে সব শুনল, তারপরে "ইগ্‌লু, তমানি, মুমু-উ-উ-উ" বলে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল।

খুব আনন্দ হলে শান্নু এইরকম অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কথা বলে হাততালি দেয় আর নাচে।

পরদিন সক্কালবেলায় রাধু বাজার যাবার সময় মাকে জিজ্ঞেস করল, "আজকে কী মাম, কিনব—ইলিশ না ভেটকি ? কী কপ্‌কা আনব—মর্তমান না কাঁঠালি ?"

মা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই সোনিয়া বলল, "রাধুদা তুমি তো বড়, ছোটদের মতো কথা বলছ কেন ? এবার থেকে মাছকে মাছ বলবে, কলাকে বলবে কলা। আমাদের স্কুলে বলে দিয়েছে, বড়রা বড়দের মতো কথা বলবে। শান্নু তো এখন একটু-একটু করে বড় হচ্ছে, আমি এবার ওকে বড়দের কথা শিখিয়ে দেব।"

রাধুদা বলল, "বেশ।"

রোজ সকালে ঘুম ভাঙলে বাবা শুয়ে-শুয়ে চা খায়। আজকেও খাচ্ছিল। চা খেতে-খেতে বলল, "তাকু আসেনি এখনো ?"

সোনিয়া জানলার ধারে বসে পুতুলকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, ওখান থেকেই ও চেঁচিয়ে বলল, "বাবা, তুমি আর কক্ষনো ভাইয়ের মতো খবরের কাগজকে 'তাকু' বলবে না। বলবে খবরের কাগজ। তুমি কি ছোট ? তুমি কি শান্নু ?"

বাবা বলল, "তাই তো, আমার একদম মনে ছিল না। এবার থেকে আমি আর শান্নুর মতো কথা বলবো না। দেখ তো খবরের কাগজ এসেছে কি না ?"

সোনিয়া ছুটে গিয়ে বাবাকে কাগজ এনে দিল।

মা সেদিন খেতে বসে সোনিয়াকে বলল, "যাও তো ও-ঘর থেকে গ-এর জাগ্‌টা নিয়ে এসো।"

সোনিয়া রাগ করে বলল, "কী বললে ? কিসের জাগ ?"

মা তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিল, "এইরে, একদম ভুলে গিয়েছিলাম, গ না, জলের জাগটা নিয়ে এসো তো।"

সোনিয়ার সামনে বড়রা এখন আর শান্নুর মতো কথা বলতে

পারে না। বড়রা শুধু বড়দের মতো কথা বলে।

শানুও একটু-একটু বড় হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই বড়দের মতো কথা শিখতে চায় না। সোনিয়া রোজ স্কুল থেকে ফিরে ওকে বড়দের কথা শেখাতে বসে। বলে, "বল তো জল।" শানু বলে "গ"। বলে, "বল তো মাছ।" শানু বলে "মাম্"।

সোনিয়া ওকে কত বোঝায়, আদর করে, কিন্তু শানু একবারও জলকে জল, মাছকে মাছ বলে না। কেউ কথা না শুনলে সোনিয়ার খুব রাগ হয়ে যায়। ও রাগ করে ঠাকুমার কাছে গিয়ে ভাইয়ের নামে নালিশ করে। ঠাকুমা সোনিয়াকে আদর করে বলে, "তুমি ওকে রোজ শেখাও, দেখবে ও শিখে যাবে।"

একদিন সত্যি-সত্যি শানু "কপকা" না বলে কলা বলল। সেদিন সোনিয়ার সে কী আনন্দ! বাবা, মা, ঠাকুমা, বন্ধুদের সবাইকে দশবার করে বলল, "জানো, ভাই না বড়দের মতো কলা বলেছে।"

আস্তে-আস্তে শানু জলকে জল, মাছকে মাছ, জুতোকে জুতো বলতে শিখে গেল। গ, মাম, তুগো আর বলে না। তবে অনেক দিন শানু "লক্ষণ" কে লক্ষণ বলতে পারতো না, বলত "লট্ঠন।"



মাকে ভাল করে দাও

ইনুর কিছু ভাল লাগে না। আইসক্রিম খেতে ভাল লাগে না। সোনা, মোনা, পিকলুদের সঙ্গে চোর-চোর খেলতে ইচ্ছে করে না। বড়-বড় কানওলা ছোট টমিটার কান টানতে ইচ্ছে করে না। এমন কী কাল যখন ছোট্‌কা বলেছিল, "এই ইনু চিড়িয়াখানায় যাবি?" ও সঙ্গে-সঙ্গে "না" বলে দিয়েছিল। অথচ ইনুর চিড়িয়াখানা কী সুন্দর লাগে। ও মোটে তিন দিন চিড়িয়াখানায় গেছে, কিন্তু এই তিন দিনেই সব্বার সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেছে। বাঘ, সিংহ, হাতি, জেব্রা, বাঁদর, আরও কত বন্ধু!

বাঁদরটাই সবচাইতে বেশি মজা করে। কী বড়-বড় লাফ দেয়। ইনু ওকে তিনটে কলা দিয়েছিল। একসঙ্গে তিনটে কলা পেয়ে বাঁদরটা কী খুশি! ইনুর দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসেছিল।

হাসিটা আর কেউ দেখতে পায়নি, শুধু ইনু দেখেছিল। ছোট্‌কাকে বলতে ছোট্‌কা বলেছিল, "যাঃ, বাঁদর আবার হাসে নাকি?"

ইনু যত বলে, "হেসেছিল, সত্যি বলছি হেসেছিল" ছোট্‌কা তত বলে, "তোর মুণ্ডু! বাঁদর হাসতেই পারে না।"

শুনে ওর খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। ছোট্‌কার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেনি। ছোট্‌কার দেওয়া চিনেবাদাম খায়নি!

বাড়ি ফিরে ছোট্‌কা বলেছিল, "আরে! সত্যিই তো! বইতে পড়েছি, বন্ধুদের দেখতে পেলে বাঁদর হাসে। শিগ্‌গিরই তোকে আর-একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব আমাকে তুই বাঁদরের হাসি দেখাবি। কি রে, দেখাবি তো?"

আর-একদিন চিড়িয়াখানায় যাবার নামে ইনুর সব রাগ জল হয়ে গেল। ও বলল, "হ্যাঁ। দেখাব, তবে তিনটে কলা দিতে হবে কিন্তু।"

ইনু চিড়িয়াখানা নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছে। রোজ ভাবে কবে আবার চিড়িয়াখানায় যাবে। তবে ছোটকাকে বললেই ছোট্‌কা বলে, “আজ আমার একটু কাজ আছে, পরে একদিন নিয়ে যাব।”

সেই ছোট্‌কা কাল যখন বলল, “এই ইনু চিড়িয়াখানায় যাবি ?”

ইনু বলে দিল, “না।”

ছোট্‌কা কতবার বলল, কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হল না। ইনুর আজকাল কিচ্ছু ভাল লাগে না, খেলতে না, খেতে না, বেড়াতে যেতে না। শুধু মায়ের কাছে থাকতে ইচ্ছে করে, মায়ের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করে, মায়ের বুকের মধ্যে শুয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করে। অথচ বড়রা ওকে মায়ের কাছে বেশিক্ষণ থাকতে দেয় না, মায়ের সঙ্গে সব সময় কথাও বলতে দেয় না। মায়ের তো অসুখ করেছে, খুব অসুখ। সেই জন্যে ইনুর কিচ্ছু ভাল লাগে না।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন অসুখ করার পর মা ডাক্তারদের বাড়ি চলে গেল। ইনু রোজ ভাবে, মা আজ আসবে, কিন্তু মা আর আসে না তো আসেই না। মাকে দেখতে না পেয়ে ওর ভীষণ কান্না পেত, ক'দ্দিন লুকিয়ে কেঁদেছে, কদ্দিন সবার সামনে কেঁদেছে।

বাবা বলে, “কেঁদো না, মা ভাল হয়ে গেছে, আর দু-এক দিনের মধ্যে দেখ ঠিক বাড়িতে চলে আসবে।”

ঠাকুমা ওকে কোলে নিয়ে বলে, “রাজপুত্তুর সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যেই না রাক্ষসদের পাড়ায় গিয়ে ঢুকেছে অমনি···।”

ইনু জোর করে ঠাকুমার কোল থেকে নেমে পড়ে বলে, “শুনব না।”

ও বুঝতে পারে ঠাকুমা ওকে ভোলাবার জন্যে মিছিমিছি গল্প বলছে।

একদিন মা সত্যি-সত্যি ডাক্তারদের বাড়ি থেকে ফিরে এল। ইস্! মা কি রোগা হয়ে গেছে! একা-একা হাঁটতে পারে না। দুই কাকিমা মাকে ট্যাক্সি থেকে ধরে-ধরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। বিকেলবেলায় দু'জন ডাক্তার এসে কানে নল লাগিয়ে মাকে দেখল। তারপর কাগজকলম নিয়ে একগাদা ওষুধের নাম লিখে দিল।

ডাক্তার দুজনকে দেখে ইন্নুর ভীষণ রাগ হয়ে গেল। এদের বাড়িতে গিয়েই মা এত রোগা হয়ে গেছে। আর কোনদিন ও মাকে ডাক্তারদের বাড়িতে যেতে দেবে না। একজন ডাক্তার আবার ইন্নুর সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল, কিন্তু ও একটা কথাও বলেনি, ইচ্ছে করেই বলেনি। ডাক্তারবাবু ওর গালে টোকা দিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বলো তোমার নাম কী বলো, বললে লজেন্স দেব।"

ইন্নু একটা কথাও বলেনি। মনে-মনে বলেছিল, "ইস্! লজেন্স! আইসক্রিম দিলেও কথা বলব না, সন্দেশ দিলেও কথা বলব না, বেড়াতে নিয়ে গেলেও কথা বলব না, তোমরা ভাল না, তোমরা মাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে রোগাকরে দিয়েছ।"

মা আগে ইন্নুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলত, "লক্ষ্মী সোনা আমার, বলো তো তুমি বড় হয়ে কী হবে?"

ইন্নু জানত না ও কী হলে মা খুশি হবে। ওই তাই জিজ্ঞেস করত, "তুমি বলো মা, কী হব।"

মা বলত, বড় হয়ে তুমি ডাক্তার হবে, অনেক বড় ডাক্তার। আমার অসুখ করলেই আমি বলব, ইন্নু কই, ইন্নু কই। তুমি বলবে, এই যে আমি। ব্যস, তুমি এসে অসুখ সারিয়ে দেবে।"

ইন্নু আগে কখনো ডাক্তার দেখেনি। ও শুনে-শুনে ভাবত ডাক্তাররা বুঝি ঠাকুরদের মতো। কাছে এলেই সবার কষ্ট সেরে যায়। মা তারপরে যতবার ওকে জিজ্ঞেস করেছে, "লক্ষ্মী সোনা আমার, বলো তো তুমি বড় হয়ে কী হবে?"

ইন্নু সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিয়েছে, "ডাক্তার হব মা, বড় ডাক্তার।"

কিন্তু এখন ডাক্তারদের ওপর ইন্নুর খুব রাগ। ডাক্তাররা ওর মাকে রোগা করে দিয়েছে। মা এখন একা হাঁটতে পারে না। দিনরাত্তির শুয়ে থাকে, ডাক্তাররা মাকে ভাত খেতে বারণ করেছে।

মা'র ওষুধ খেতে একটুও ভাল লাগে না, অথচ মাকে সব সময় ওষুধ খেতে হয়। ওষুধগুলোর কী বিচ্ছিরি গন্ধ। সেদিন মেজদি কাঁচা লঙ্কা আর কাসুন্দি দিয়ে মেখে কাঁচামিঠে আম খাচ্ছিল টকাস্-টকাস্

করে। মা যেই না বলেছে "আমাকে একটু দিবি," অমনি মেজদি ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। সেই থেকে মেজদির ওপরেও ইনুর রাগ, তবে ডাক্তারদের ওপর অনেক, অনেক বেশি রাগ। ও মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছে, বড় হয়ে ও কক্ষনো ডাক্তার হবে না।

মায়ের কেন অসুখ করেছে, কবে সারবে—কেউ বলে না। জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে, "ভাল হয়ে যাবে, ভাল হয়ে যাবে।" এক কথা শুনে-শুনে ওর খুব রাগ হয়ে যায়। ও লুকিয়ে-লুকিয়ে বাথরুমে গিয়ে তেলের শিশি উল্টে দেয় আর সাবানটা ফেলে দেয় চৌবাচ্চার মধ্যে।

সেদিন বিকেলেই ছোটপিসি ওকে ছাতে নিয়ে গিয়ে বলল, "মায়ের অসুখ কেন করেছে জানিস ?"

"কেন ?"

"তুই দুষ্টুমি করিস বলে।"

"ধ্যাত্‌!"

"হ্যাঁ, তুই দুষ্টুমি করিস, মায়ের কথা শুনিস না, খেতে বললে খাস না, একা-একা বড় রাস্তায় চলে যাস, ছড়া মুখস্থ করিস না, টমির কান ধরে টানিস, সেইজন্যে মায়ের অসুখ করেছে।"

"আহা, তাই কখনো হয় ?"

"হ্যাঁ রে সত্যি, আচ্ছা আমি তিনসত্যি করছি, এক সত্যি, দুই সত্যি, তিন সত্যি।"

তিনসত্যি করলে কেউ তো আর মিথ্যে কথা বলতে পারে না। ছোটপিসি তাহ'লে সত্যি কথা বলেছে। ইনুর হঠাৎই খুব কান্না পেয়ে গেল, ইস্‌, ওর জন্যেই মায়ের কত কষ্ট, মা একা-একা হাঁটতে পারে না, দিনরাত্তির শুয়ে থাকে, মা কী রোগা হয়ে গেছে।

ও কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "ছোটপিসি, এবার আমি ভাল হব, দুষ্টুমি করব না, মায়ের কথা শুনব, একা-একা রাস্তায় যাব না।"

শুনে ছোটপিসি বলল, "লক্ষ্মী ছেলে। এবার দেখবে তোমার মা ভাল হয়ে যাবে। তুমি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বলবে, "ঠাকুর, মাকে ভাল করে দাও, আমি আর দুষ্টুমি করব না।"

ইনু ঘাড় কাত করে বলল, "আচ্ছা।"

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই ইনু খাট থেকে নেমে পড়ল। তারপর সোজা চলে গেল ছাতে। ছাতে ঠাকুরঘর। ঠাকুমা, মা কাকীমারা সবাই ঠাকুরঘরে বসে পুজো করে। অত সকালে কেউ আসে না। ইনু একা কোনো দিন ঠাকুরঘরে আসেনি। ঢুকতে ওর কেমন ভয়-ভয় করছিল। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না। মাকে ভাল করতেই হবে। টমিটা কোথেকে লম্বা কান দুলিয়ে ছুটে আসতে ওর সাহস হল। টমিকে বলল, "টমি, তুই একটু দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি।" বলেই একছুটে ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়ল।

দেয়ালে, ছোট-ছোট জলচৌকির ওপর অনেক ঠাকুরদেবতা। ইনু মেঝের ওপর টিপ্ করে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "ঠাকুর, আমার মাকে ভাল করে দাও। ঠাকুর, আমার মাকে ভাল করে দাও। ঠাকুর, আমার মাকে ভাল করে দাও। আমি আর দুষ্টুমি করব না। মায়ের কথা শুনব, সত্যি বলছি শুনব।" ইনু লুকিয়ে পকেটে করে দুটো বাতাসা নিয়ে এসেছিল। ঠাকুরদের সামনে রেখে বলল, "তোমরা ভাগ করে খেয়ে নিও।"

টমি দরজার সামনে বসে ছিল। ইনু বেরোতেই লাফাতে শুরু করে দিল। টমি যত লাফায় ওর লম্বা কানদু'টো তত দুলতে থাকে!

কান টেনে দেবার জন্যে ইনুর খুব লোভ হচ্ছিল। কিন্তু না, টমির কান টানলে মায়ের অসুখ সারবে না। ইনু কান টানার বদলে টমিকে কোলে নিয়ে খুব আদর করল। টমি কুঁই-কুঁই করে কী যেন বলল। ইনুর মনে হল, টমি বলছে, ইনুদা, তুমি খুব ভাল হয়ে গেছ। তোমার মা দেখো শিগগিরই ভাল হয়ে যাবে।"

ইনু সত্যিই খুব ভাল হয়ে গেছে। সবার কথা শোনে। চান করার সময় চান করে, খাবার সময় খায়, একটুও খাবার নষ্ট করে না। সকাল আর সন্ধ্যেয় ছড়া মুখস্থ করে, একা-একা বড় রাস্তায় যায় না। এটা দাও সেটা দাও বলে বায়না করে না। সবাই বলে, ইনু কী লক্ষ্মীছেলে!

কিন্তু কেউ তো জানে না ইনু কেন লক্ষ্মী ছেলে হয়েছে। শুধু ইনুই

জানে। আর জানে ঠাকুররা। ও রোজ সকালে ঠাকুরদের প্রণাম করে তিনবার বলে, "ঠাকুর আমার মাকে ভাল করে দাও। আমি আর দুষ্টুমি করব না। মায়ের কথা শুনব।"

দু-দিন ঝড় হল, তারপর একদিন বৃষ্টি হল, খুব বৃষ্টি। ইনুরা সেদিন আলুর চপ আর মুড়ি খেল। কাকীমা বলল, "বর্ষাকাল শুরু হল, এবার দেখবি প্রায়ই বৃষ্টি হবে।"

টমিটা আজকাল খুব দুষ্টু হয়েছে। বৃষ্টি হলেই ছুটে বাইরে গিয়ে ভিজে আসে। ইনু কত বারণ করে, কিন্তু টমি কথা শোনে না। ইনুর খুব রাগ হয়, এক-একদিন ওর লম্বা-লম্বা কান মলে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু না, কান মলে দিলে তো দুষ্টুমি করা হবে, আর দুষ্টুমি করলে তো মায়ের অসুখ ভাল হবে না।

ইনুর মা এখন আগের চাইতে অনেক ভাল হয়ে গেছে। একা-একা এঘর-ওঘর যায়, তবে রান্নাঘরে গিয়ে কাজ করতে পারে না। অল্প ভাত খায়। ইনুর বাবা সেদিন ইনুকে বলেছে, "তোমার মা আর কয়েক দিনের মধ্যে একদম ভাল হয়ে যাবে, তখন মা তোমাকে নিয়ে শোবে। তুমি দেখবে তো মা ওষুধ খায় কি না, ওষুধ না খেলে কিন্তু অসুখ সারবে না।"

শুনে ইনু মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু মনে-মনে বলেছে, "ইস্! ওষুধ! আমি রোজ ঠাকুরকে ডাকি, লক্ষ্মী হয়ে থাকি, সেই জন্যেই তো মা ভাল হয়ে উঠছে। সত্যি কি না, ছোটপিসিকে জিজ্ঞেস করে দেখ। ওষুধ ভাল না, ডাক্তাররা ভাল না, ডাক্তারদের বাড়ি গিয়ে মা কীরকম রোগা হয়ে গিয়েছিল, মনে নেই?"

একদিন বিকেলে ইনু বাগানে গিয়ে দেখে, ওমা! কত ফুল ফুটেছে! বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, আরও কত কী—ও তো সব ফুলের নাম জানে না। ফুলের গন্ধ কী মিষ্টি! ইনু বড়-বড় নিশ্বাস টেনে ফুলের গন্ধ নেয়। মা যখন চান করে আসে, তখন মায়ের গা দিয়ে ঠিক এইরকম গন্ধ বার হয়।

সন্ধেবেলায় বাবা অফিস থেকে ফিরে এল। বাবার এক হাতে

অ্যাত্তো বড় একটা মাছ আর এক হাতে অ্যাত্তো বড় এক প্যাকেট মিষ্টি। ইনু বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের বাড়িতে আজকে কী কেউ নেমন্তন্ন খেতে আসবে ?"

বাবা বলল, "না তো, আজকে রাত্তিরে তুমি, তোমার মা আর আমরা সবাই একসঙ্গে খাব। ডাক্তারবাবু বলেছেন, মায়ের অসুখ একদম সেরে গেছে। খেয়েদেয়ে তুমি আজকে মায়ের সঙ্গে ঘুমোবে।"

শুনে ইনুর সে কী আনন্দ! ছুটে পাশের বাড়ি গিয়ে সোনা, মোনা আর পিক্‌লুকে বলে এলো, "এই জানিস, মা না একদম ভাল হয়ে গেছে। মা'র আর অসুখ নেই। আমি আজ রাত্তিরে মা'র সঙ্গে ঘুমবো।"

তাই না শুনে সোনা, মোনা আর পিক্‌লু হাততালি দিয়ে বলে উঠল: কী মজা! কী মজা!

টমিটা তো বৃষ্টি হলেই ভিজে আসে। তাই টমিটার গায়ে সব সময় ধুলোবালি। কিন্তু ইনুর আজ এত আনন্দ হচ্ছিল যে, টমিকে কোলে নিয়ে খুব আদর করে বলল, "এই টমি, জানিস, মা না ভাল হয়ে গেছে। আজকে আমি মা'র সঙ্গে ঘুমবো।"

তাই না শুনে টমি খুব কুঁই-কুঁই করল। ইনুর মনে হল টমি বলছে, "ইনুদা, মা তো ভাল হবেই। তুমি কত লক্ষ্মী হয়ে গেছ। আর তো আমার কান ধরে টানো না।"

ইনু মায়ের পাশে খেতে বসল। মায়ের ও-পাশে তুই কাকীমা, তারপরে মেজদি, তার পরে বাবা, ছোটকা, মেজকাকা। খেতে-খেতে কত গল্প হল, কত হাসি হল। মাকে দেখতে কী সুন্দর লাগছে। সবাই মাকে বলছে, "তুমি এটা খাও, তুমি ওটা খাও।"

মা হাসছে আর বলছে, "আর কত খাব, আর কত খাব।"

যেই না খাওয়া শেষ হয়েছে অমনি ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। ইনুর অল্প-অল্প শীত করছিল আর ঘুম পাচ্ছিল খুব। ইনু মায়ের আঁচল ধরে বলল "মা, আমি তোমার সঙ্গে ঘুমবো।"

মা ওকে কোলে তুলে নিয়ে গালে চুমু খেয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঘুমোবেই

তো। লক্ষ্মী সোনা আমার।"

শুনে ইনুর এত আনন্দ হলো যে, মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকলো ও। মায়ের গা দিয়ে বাগানের ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে, কিন্তু মা তো এখনও চান করে আসেনি! মা ওকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এসে ছোট্ট নীল আলোটা জ্বালিয়ে দিল। নীল আলো ইনুর খুব ভাল লাগে। ও আর মায়ের কোল থেকে নামল না। মা ওকে কোলে করে নিয়েই শুয়ে পড়ল, তারপর জড়িয়ে নিল বুকের মধ্যে। বাইরে ঝিমঝিম করে বৃষ্টিপড়ছে। ইস্, কী ভাল লাগছে ইনুর! কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে ইনু বলল, "মা, তোমার অসুখ কেন সেরে গেছে জানো?"

মা বলল, "না তো।"

ইনু বলল, "আমি রোজ সকালে ঠাকুরকে বলতাম, ঠাকুর আমার মাকে ভাল করে দাও, আমি আর দুষ্টুমি করব না, লক্ষ্মী হয়ে থাকব, মায়ের কথা শুনব, সেইজন্যে ঠাকুর তোমাকে ভাল করে দিয়েছে।"

তাই না শুনে মা ওকে বুকের মধ্যে আরও টেনে নিয়ে বলল, "ওমা, তাই নাকি! আমি তো কিচ্ছু জানতাম না, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাগ্যিস তুমি ঠাকুরকে ডেকেছিলে।"

মায়ের কথা শুনে ইনুর সে কী আনন্দ!

একটু পরে ও আবার বলল, "মা তুমি আর ডাক্তারদের বাড়ি যাবে না, ডাক্তাররা তোমাকে রোগা করে দিয়েছিল, ভাত খেতে দিত না, খালি ওষুধ আর ওষুধ, ডাক্তাররা ভাল না।"

মা ওর গালে, কপালে অনেকগুলো চুমু খেয়ে বলল, "আমি আমার ইনু সোনাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।"

ইনু ওর ছোট-ছোট হাতদুটো দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মা আমার ঘুম পেয়েছে, তুমি গান করো, আমি ঘুমবো।"

মা গুনগুন করে গান করতে লাগল, আর সেই গান শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল ইনু।
